প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরিবের ঘরের দুটী মেয়ে।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের ...দূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ...নবান্ জমীদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য সেই ...ন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান লোকই এরূপ ...হতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল স্থানে ...দখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, ...ত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় ...অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য ...ল্লি আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ...র কুমার, এক ঘর কামার ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। ...কখানি মুদির দোকান আছে তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য ...ব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ...কটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়। ...ষ্করিণীর নাম "তালপুখুর", এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে ...ালপুখুর গ্রাম বলে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুখুরে ...য়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটীর বয়স ৯ বৎসর, ছোটটীর ...য়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যাব সময় সে পুখুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তাল বৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে, নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়। পুখুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকট দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দিনের পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামসূচক দীর্ঘ শ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তাঙ্কিত মুখ হইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর একবার আকাশের দিকে দেখিয়া, সেই শীতল বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, একবার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।"

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা। "না মা এত সন্ধ্যাব সময় কি ডুব দেয়, অসুখ করিবে যে।"

বিন্দু। "না মা অসুখ করিবে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে। তুমি জলে নামিলে আবার সুধা ডুব দিতে চাহিবে, ওর আবার অসুখ করিবে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে।"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোনটীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগ্নী দুটীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্র বালিকা দুটীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চায়, একটু মিষ্ট কথা বলিয়া একটু সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েতের মেয়ে, হরিদাস মল্লিক নামক একটী সামান্য অবস্থার লোকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ২০। ২৫ বিঘা জমী

ছিল, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া জমিদারের খাজনা দিয়া বড় কিছু থাকিত না; যাহা থাকিত তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র। অনেক কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তারিণীচরণ মল্লিক নামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বর্দ্ধমানে চাকরি করিত, কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভাইয়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা, আপনার ভাইয়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫। ১০ টাকা কর্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর পর তাঁহার একটী কন্যা হয়, এতদিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরিবের ঘরের মেয়ে, আদর ও পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাড়ীতে আসিতেন তখন মেয়েদের জন্য কেমন ঢাকাই কাপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোনার চুড়ী, কেমন কানের কানবালা আনিতেন, বিন্দুর বাপ মা অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দুগাছি অতি সরু সোনার বালা ও দুই পায়ে দুইগাছি রূপার মল গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না, একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জেঠাইমার মেয়েদের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভাল মানুষ কখনও কাহাকে রাগ করিয়া কথা কহিত না, সুতরাং তাহারাও বিন্দুকে ভাল বাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুথুল কিনিলে একটী সোলার পুথুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়ীতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত; বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন আর নিজের চক্ষের এক বিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পর তাহার একটী ভগ্নী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু দুটী কাল২ ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটীতে সদাই

সুধার হাসি। গরিবের এই অমূল্য ধনকে গরিব বাপ মা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং দুইটি মেয়ে হওয়াতে বাপ মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু দুদ চাই; এমন সুন্দর মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই এক খানা গয়না হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়ষীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয় কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপ মার মনে কত সাধ হয় কিন্তু উপায় কৈ? গরিব দুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যা দুটীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুখুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরের আহার করিয়া কন্যা দুইটীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ার ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসার কার্য্য করিতেন। তথাপি এসংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা একজন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদাশিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পর হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লি কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন,—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন, এ আঁধারের একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ

শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেই পথ দিয়া যাইবার সময় একটী অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে জমী ছিল তাহা তারিণী বাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষ হাত তুলিয়া যাহা দেন বিন্দুর মাতা তাহাই পায়। তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না মেয়ে দুটীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট্ দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাক ঘরে আসিয়া চক্ষুর এক বিন্দু জল মুছিতেন। ভাবিতেন "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয় আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি, তাহা হইলেই আমার সুখ।"

* * * *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন "আয় মা বিন্দু ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে, আহা বাছার ননির শরীর এই টুকু এসে ক্লান্ত হয়েছে। আহা বাছা যে ছেলে মানুষ, হাটতে পারবে কেন? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

বিন্দু। "হ্যা মা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়. বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘ ও হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয় জল হবে।"

বিন্দু। "না মা আমিই কোলে নি,—সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে

রাত্রিতে সুধাকে কোলে করে এনেছিলুম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নেযেতে পারবো না ? ঐ ত রান্নাঘরের আলো দেখা যায়।"

মাতা। "তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার যেন প'ড়ে যাস্নি। ঐ সেদিন তোর জেঠাইমার মেয়ে উমাতারা রাত্রি বেলা মেলা থেকে আস্‌ছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিয়েছে।"

বিন্দু। "মা উমাতারারা কোন্ মেলায় গিয়েছিল ? কেমন সুন্দর সুন্দর পুথুল এনেছিল, একটা কাঠের ঘোড়া এনেছিল, একটা মাটীর সিংহ এনেছিল আর একটা কেমন কল এনেছিল সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা ?"

মাতা। "তা জানিস্ নি ? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল; সেখানে বছর২ ভারি মেলা হয় কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু। "মা তুমি কখন সেখানে গিয়াছিলে ?"

মাতা। "গিয়েছিলুম বাছা যখন আমি ছোট ছিলুম একবার আমার বাপ মা গিয়াছিলেন, আমরা বাড়ী সুদ্ধ গিয়াছিলুম, সেখানে তিন চারি দিন ছিলুম, একটা গাছ তলায় বাসা করে ছিলুম।

বিন্দু। "কেন ঘর ছিল না ? গাছ তলায় বাসা করে ছিলে কেন মা ?"

মাতা। "সেখানে কত হাজার হাজার লোকে যায় ঘর কোথায় ? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানি পসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রি হয়।"

বিন্দু। "মা আমি একবার যাব, আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

মাতা। "আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে তোকে নিয়ে যাব কত টাকা খরচ হয়।"

বিন্দু। "না মা আমি আর বৎসর যাব। উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না ?"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়না মেয়ে অমন করে কি বায়না করে ? তোর জেঠাইমারা বড় মানুষ, তাঁহার ছেলেরা যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়;

তোরা যা গরিবের ঘরের মেয়ে তোদের কি বাছা বায়না করিলে সাজে? আহা ভগবান যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত তাহা হইলে কি আর অন্ন বস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয়? তাহা হইলে কি আমার সোনার পুথুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে? হা ভগবান্! তোমারই ইচ্ছা!"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কালো মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে কেবল এক এক বার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়াছে, গোরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র মধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগ্নী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাই-

তেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুখুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম কাঁঠাল তাল নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মোনসা প্রভৃতি কাটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পুরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০। ৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষীগণ কুলায় নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫। ৬ টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায় ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুখাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটা তকতাপোশ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুল গাছ, কয়েকটী কলাগাছ, ও একটী আঁবগাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটী ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটী দুই বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুন্ গুন্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত কিন্তু একটু শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি তাহার কিছু ইঁহার নাই, সে প্রফুল্লতা সে উদ্বেগ সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগ্নী বা কন্যা বা আত্মীয়াগণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন চাহিয়া দেখ, দেখিয়া বল ছার উপন্যাসের কাল্পনিক অলীক সুখ কয়জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন এসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটিতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ধরণীও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুটীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুই একটী রেখা অপনীত হইল।

রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন তখন তাঁহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না হাস্য-বদনা সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা বসিয়া একটী বিড়াল শিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়াল শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সরিয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে; সে প্রফুল্ল অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটী যেন উল্লাসে হাসিতেছে, সে বিশ্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সে সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু-সঞ্চালিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানিও হাস্য বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তা-শূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে।

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকাও বিড়াল শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

সুধা। "দিদি আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমাইতেছিলে তাই জাগাই নাই। আর দেখ দিদি, এই বেরাল ছানাটা আমি যেখানে যাব সেইখানে যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করিয়া বাসন মাজিতে গেলুম ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুল সব ঘরে বন্ধ করিয়া রেখে এসেছ ত?"

সুধা। "হাঁ সব মেজে রেখে এসেছি। আর তারপর বেরালকে গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলুম আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুথুলটা নিতে চায়, তা আমি দিচ্ছি এই যে।"

বিন্দু। "তা ব'ন এতক্ষণ এসেছ একবার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয নি, একটু ঘুমও না।"

সুধা। "না দিদি আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলুম। কেবল একবার খোকা যখন কেঁদেছিল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হইলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষধ আনবেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জরও আস্‌বে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন্ আস্‌বেন দিদি?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, কেন?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা করব, তা দিদি তোমাকে, বল্‌ব না, তিনি এলে দেখতে পাবে। যেমন আমার গায়ে সেদিন ফাগ দিয়েছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিবে বল না"।

সুধা। "না দিদি তুমি ব'লে দেবে।"

বিন্দু। "না বলিব না।"

সুধা। "সত্য বলিবে না?"

বিন্দু। "সত্য বলিব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল। জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ।

বিন্দু। "ও কি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখ্‌তে পাচ্চো না।"

বিন্দু। "দেখ্‌ছি ত, এ কি পাট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি।"

বিন্দু। "কেন উহাতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাতে পারিলে না। যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমবেন, আমি এইটা তাঁহার দাড়িতে বেঁধে দেব, তাহার পর উঠিলে তাঁহাকে জটাধারী সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা করিব। খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগ্নীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হইয়াছে জেনেও জানে না! নিদারুণ বিধি! কেমন করে এই কচি ছেলের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখিলে,—কেমন করে এ প্রফুল্ল সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার ৯ বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। আমাদের গল্প এই সময় হইতে আরম্ভ। এই নয় বৎসরের ঘটনা গুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটী অনাথা কন্যাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মরিবার পূর্ব্বে দুইটী মেয়েকে বিবাহ দিয়া যান। যে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুখুরে গিয়াছিলেন তখন বিন্দুর বয়সও ৯ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতায় বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লিগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কায কর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালনপালন করিতেছেন, তাহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ যায় না। আত্মীয়েরাও এবিষয়ে

বড় মনোযোগ করিলেন না, কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দুটী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মেয়ের জেঠাইমা রকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকাল বেলা কেশবিন্যাস কবিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন (বিন্দুর মা চুলের দড়ী ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বের জন্য ভাব্‌তে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই র'স না তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ করিয়া দিব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করিতেছে, বে দিলেই এখনি মাথায় করিয়া লইয়া যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ করিব যে কুটুমের মত কুটুম হইবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমাব মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বন তেমন টাকা কড়ি নাই আমার দেওয়র তেমন সেযনা ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই যা বল। তা ভেবনা বোন, আমি যখন এবিষয়ে হাত দিয়াছি তখন আর কোন ভাবনা নাই।" আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু জেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুব বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা! ছেলেদের জন্য কত পোশাক, কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মশাই বাড়ী আসিয়াছেন গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল; কত খোসামোদ, কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকুরি চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না কেবল বড়

লোকের খোসামোদটা অভ্যাস মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধূমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে কেই বা শোনে। ১৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মশাই আবার বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধের কিছুই স্থির হইল না।

পড়শীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধা দিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন "তা দিব বৈকি, তোমার দেব না ত কার দেব। তবে কি জান বাছা আজ কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতে থুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায় নাই তেমন গোছান লোক হতো, ঐ তোমার ভাসুরের মত টাকা করিতে পারিত তবে আর কি ভাবনা থাকিত? সেই সময় আমি কত বলেছিলুম, তা তখন সে গা করতো না, তোমরাও গা করিতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হইলেই ভাল লাগে। তা দেব বৈকি বাছা তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিব এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন "তার ভাবনা কি? বিন্দুর বেব আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে শুনতে একটু ভাল হত তবে এ কাযটা শীঘ্র শীঘ্র হইত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে, ছিরি আছে, তবে রংটা বড় কালো আর চোক্ দুটা বড় ডেবডেবে, আর মাথায় বড় চুল নাই। না তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড় গুল যেন কির কির করচে, হাত পা গুল কেমন লম্বা লম্বা আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে। তা হোক, তুমি ভেবো না, কাল মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি আট্‌কে থাকে তা থাকবে না, যখন আমরা আছি তখন কিছু আটকাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধা দিগের যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েক দিন

তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাটি করিলেন, কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিশ্রী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন। গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাস বাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন,এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটী মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন "তা এ কথা আমাদের এতদিন বল নি? এ সব কায কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বলিলেন, অমনি কাযটা হইয়া গেল। কেমন বে দিয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নাই,টাকার অভাব নাই,যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করিয়া দিলাম। ছেলেটী দোজবরে বটে আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশি হয় নাই, আর কালীতারা ৮ বৎসরের হইলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাত করিতেছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখাপড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবরদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা গাড়ী ঘোড়া লোক জন বাবুয়ানা দেখিলে লোকে বলে, হাঁ জমিদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এতদিন কোথা হাঁটাহাঁটী কর্‌ছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে তবু ভাল।" সজল নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন, এবং এমন লোকের নিকট পূর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বলিলে তখন আর ভাবনা নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতেছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া খাওয়া

ঘুম ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্গুণবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ ঝি কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্বার্থ যত্ন করেন, কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্বে দোষের জন্য বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন, এবং নিঃস্বার্থ রূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্য ব্যয়ে ক্রুটী করেন না। তবে কাযের সময় সহায়তা করা,—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্ত প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচ্ঞায় কেহ একটী কপর্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন তবে দেখিতেন এ সদ্গুণগুলি জগতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে এ প্রচুর আশ্বাস বাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুখুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তালপুখুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বসু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার

বিষয় বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুষ্ক ম্লান মুখখানি ও দুই একবার গোপনে দেখিলেন, এবং তৎপর বিন্দুর মাতাকে ও জেঠাই মাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জেঠাই মা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড় মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় কুটুম করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই,—আমাদিগের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই?

বিন্দুর সরলস্বভাব [জেঠাই মা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই,—কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না,—কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন, এবং পাড়া পড়ষী মেয়েরা যখন বিবাহ বাটীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ বিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আহা আমার উমাতারাও যে বিন্দুও সে, আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায় নাই, আমি না করিলে কে করে বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়ষীগণও "তুমি বলিয়া করিলে, নৈলে কি অন্যে এতটা করে" এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও

বে দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০। ১২ বৎসরের সময় নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাছা সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি তবে আমার জীবনের সাধ মিটিবে না।" হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণী বাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদিগের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরে সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটিতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্ল বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুতুল খেলা করিতে লাগিল।

সীতারাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে কারারুদ্ধ বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া বিদায় দিয়া সীতারাম দেখিতে আসিয়াছিলেন, যে আর কেহ কারাগার মধ্যে আছে কি না। আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে শ্রী সেখানে পড়িয়া আছে। সীতারাম বলিলেন, "শ্রী— তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। শিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের তেমন বোধ সোধ নাই।

অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে? আমার উপর এখন রাজার দৌরাত্ম্য—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এই খানে থাকিবে? এ যে কারাগার, এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে, বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামাপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেই খানে যাইবে। সে খানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেই খানে যাও। সেখানে যেখানে তোমার অভিলাষ সেই খানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে, যে দুরন্ত সিপাহীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন, বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া, স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল,

"এত দিন পরে, এ কথা কেন?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে।

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করি-

যাছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? যাইব বই কি? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া, আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য, যে এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার স্নেহের অধিকারিণী, আমি তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী—আমি তোমার দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। নন্দা তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, রমা তোমার তৃতীয়া স্ত্রী, আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, দুশ্চরিত্রা ও নই, জাতিভ্রষ্টা ও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখন বল নাই যে কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথা গুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না?

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে, না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাইদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে শিপাইরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন,

"এখন, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না। কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকার হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমাব পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ

---

* চন্দ্রাগারে খাগ্নিভাগে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃর্ত্তিজ্ঞস্য শিল্পে প্রবীনা।
বাচাংপত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥
ইতি জাতকাভরণে।

তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যজ্যা হইয়াছ।” এই বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন,

“দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, ‘আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে স্থানে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয়, বা প্রীতি না জন্মে সেই ব্যবস্থা করুন।’ পিতৃঠাকুর, এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন, যে আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। পাছে তাঁহার পরলোকের পর, আমি তোমার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া এ আজ্ঞা পালন না করি, এই আশঙ্কায় তিনি আমাকে কঠিন শপথে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।”

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন,

“আমার কথা বাকি আছে। যতদিন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।”

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও? তুমি তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছ—সে শপথ কি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে কি তাহা পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেননা যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম

করিতেছি—ইহা বুঝিয়াছি। শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে—বিপদে পড়িলে নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ ইহা তোমার অশেষ গুণ। কিন্তু আর কখন ইহাতে আমার প্রয়োজন হইবে না। আর কখন আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না, বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না! গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী, সেই সুবর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ তা বৈকি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই। একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যে তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া একজন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে, আমি তাই দিব।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।

স্বীকার করি. তবু শ্রীকে মনে করা সীতরামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে, যে কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাত্তির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ—যার এক দিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রে শ্রীর চাঁদপানা মুখ খানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তা না! তবে তার রূপেতে. তার দুঃখেতে, আর স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরুপুরোহিত ডাকিয়া, শপথ লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য, যে কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়াঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল, যে আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। পরশুরামের কুঠার তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলেন যে আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। কিন্তু পর দিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। এদিকে উচ্ছসিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা, চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক—এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য, বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়াইয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান্—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন— কই, শ্রী কোথায় নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই যাকে ডাকি, তাত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয় বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুজিতে জানি না। তা কি করিব, —আরও খুঁজি। যাহাকে ইহ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহ জীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাত কালে শ্রী. সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপ মাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন তাহার উপযুক্ত মহিষী কই? নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা? না যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণ জয় করিয়াছিল, সেই সে সিংহাসনের যোগ্য? যদি শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারে?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই, গঙ্গারামকে

শ্যামাপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামাপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামাপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামাপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, যে গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"গঙ্গারাম। তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি! আপনি ত তাহাকে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন।"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না!

সীতা। তবে তুমি এই ক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এই খানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হয় আমি দিতেছি।"

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্ন পূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল—কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে —"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনাআপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মাগণ খুব বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হাঁ অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান * যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের

---

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী "গোঁয়ার". অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। ধার্ম্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধর্ম্ম দুইপাদ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম তিনপাদ, অর্জ্জুনেরই ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রা। মহাভারতকার স্বয়ং, অথবা যিনি মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক্ এরূপ মনে করেন না—তিনি বয়োনুসারে ধর্ম্মের অনুপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। স্থূল কথা যুধিষ্ঠির যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সাবধানতা তাহার একটি কারণ। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই অবধানপরতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন,

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ, যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন; † আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি! তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ—আমরা জানি তিনি লম্পট, ননিমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ, তাঁহাকে যে জাতি এই পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ

---

† যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই সকল কথা গুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। তবে সমকালিক ইতিহাসে এই রূপ ছায়া পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট।

দিয়া, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নহ, কেননা সম্রাট ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকারী হয় না, তুমি সম্রাট নহ। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না, ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।"

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখন নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না * কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরা-

---

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন, "আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিয়া যাইতেন না।

সন্ধের ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে ;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে ; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়, জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না ;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্ম্মিক; কেননা তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন জরাসন্ধ জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি, কেন

না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিনজন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—যে তিন জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস, ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসজ্জার এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া,প্রাকার চৈত্যচূর্ণ করিয়া জরাসন্ধ সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটী কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, যে হাঁ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাঁরা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রু নিপাত করিবেন বলিয়াই এ নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে ইহাঁরা

ধর্ম্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য; তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথ কালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই, প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, একজনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা হরণের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিবেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার

করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল ? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল ? ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে ? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিপ্ত ? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি যে মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটা পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশ বিশেষ বা কতকগুলি শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি ? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে তাহার বিচিত্র কি ?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোনটি প্রক্ষিপ্ত, কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে, যে সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে

লেখা আছে যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া মিটমাট্ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথা গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা গুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর, নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনা প্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধ পর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক এখন জগতের প্রধান মনুষ্য। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু তাঁহারাই ইউরোপে

মান্য—Francisd; Assisi বা Imitation of Christ' গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের ভাবতের দ্বিতীয় কবির ও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথ বধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুদ কৌশলের তিনিই রচয়িতা। তাহা আমি ঐ সকল পর্ব্বের সমালোচনা কালে বিশেষ প্রকারে দেখাইব। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশল বিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে, হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

পুষ্প নাটক।

যূথিকা ও বৃষ্টিবিন্দুর প্রবেশ

যুথিকা। এসো, এসো প্রাণনাথ এসো; আমার হৃদয়ের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কতকাল ধরিয়া তোমার আশায় উর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তাকি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবন শুষ্ককর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল! তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কতকাল হইল! এখন দেখ সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া ক্রমে পশ্চিমে

হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক্! দূর হৌক—তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটীতে পড়িও না! আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ! তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর!—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুঁই টা। এতকাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল—তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে, একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা! আঃ তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগর। ত দিদি! আমরা কি আর ফুট্‌তে জানিনে? তা, সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুট্‌তে হয়, দুপরেও ফুট্‌তে হয়, গরমেও ফুট্‌তে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুট্‌তে হয়, না ফুট্‌লে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

টগর। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জাননা কি যে তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে! আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চস্তরে

অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্নস্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন,—আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে ঘোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্, এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে তত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো খানিক ডাক হাঁক করি। কেহ ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিনী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশ প্রান্তে, কখন আকাশ মধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখন চিকি চাকি—

যুঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র!

বৃষ্টিবিন্দু। আছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ ছেলে ছোকরা হাল্কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ বেটা কি ভারি রে! আয় না, তোদের মত দুলাখ্ দশ লাখ্ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার

এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ব্বও থাকিত না। পাপিয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিনী!

যুঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিগে যায়, সেই দিগে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যুঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যুঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের কথায় কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌরভ, দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্! ঐ দেখ বাতাস আসচে!

যুঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে যে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যুঁই। থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।— আমি উহার বলে পারি না।

যুঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব! তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি। নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস্—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে! আমি তবে যাই?

যুঁই। থাক্ না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাকনা—থাকনা—থাকনা।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যুঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

[যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যুঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যুঁই।—(বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন।

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস—

যুঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যুঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্য-প্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে,

কোথায় শুকিলে, প্রাণাধিক! হায় আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলাম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ— পরিমল দে—

যুঁই। ছাড়! নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যান্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুঁম্!

যুঁই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্!

[ইতি যুঁথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হুঃ! হায়! হায়!

যবনিকা পতন।

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল!

দ্বিতীয় ঐ। তাইত! একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার তত টা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower plot on the evening of the 19*th* July, 1885 Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সীতারাম।

দ্বিতীয় খণ্ড।
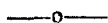
প্রথম পরিচ্ছেদ।

সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না, কেন না তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্ত ভাগ হিন্দু সাম্রাজ্য যদি অধিকৃত করিত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিল পরিমিত অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্ত ভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী, পরিত্যক্তা, উদাসিনী। বোধ হয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, নয়ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এই সকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্যস্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোলযোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন হয় না।

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে

চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তখন সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, "যে রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্য বশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না, তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।"

এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন, মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই, যে শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

কেহ কিছু জানিতে না পারুক, তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়-মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষীধর্ম্ম পালন করিয়া সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময়েই সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামির অনাস্থা ও অন্য মন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত; সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত "আর আমাকে ভাল বাসেন না কেন?" নন্দা ভাবিত, "তিনি ভাল বাসুন না বাসুন, ঠাকুর করুন আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।"

শেষে সীতারাম, ভার্য্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন, যে তিনি এপর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেন না দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ, রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ, দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর। সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি বলে ছলে, সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন? সুবেদার বলিতে পারেন, এ বেচারা নিরপরাধী, কিস্তি কিস্তি বিনা ওজর আপত্তি খাজানা দাখিল করে, বকেয়া বাকির ঝঞ্ঝট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন? তখন মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই সুবেদারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য তোরাব খাঁ, তাহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ—অতি শঠ। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন। যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে, মুরশিদ বলিবেন, নিরপরাধীকে নষ্ট করিলে কেন? যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন, বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন? অতএব তোরাব যাহা হয় একটা করুক, তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাব ও কিছু করিলেন না।

কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে, দেশে সঙ্কুল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ মনুষ্যাধম মুরশিদ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মুসনদে আরূঢ়

---

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা মূর্খতা নিবন্ধন সেরাজ উদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুরশিদ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজ উদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।

থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লেখে না। মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এই খানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন— "সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে উদ্যোগ কর, বলিবা মাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না। কেন না মুরশিদ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল—যে সাধারণ 'শান্তি রক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। একজন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তি রক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন শিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিগে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে যখন শুনা যাইতেছে যে সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত শিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য শিপাহী সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই একদিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ, বা বেহার, বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কাল বিলম্ব হইল। ততদিন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম, সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে অসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা শিপাহী সংগ্রহ হইতেছে ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন। সীতারামকেও জানাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই সীতারাম দিল্লী যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

অসময় হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে ফৌজদাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ইহা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে সুবাদার আছে; সুবাদার পরাভূত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে। এমন কোন ভরসা নাই, যে আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব। অতএব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ্য প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন, এক দিন বা এক পুরুষের কাজ নহে। মোগলের রাজ্য একদিনে বা এক পুরুষে স্থাপন হয় নাই। এই পত্তনে মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না, তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচ পত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে; কেন না এখন দিল্লীর আমীর ওমরাহ, কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক অনায়াসে এ কাজ সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদিই ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃন্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃন্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী। আর কেবল তাহার বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি

না। আমার এমন ভরসা আছে, যে যত দিন না তুমি ফিরিয়া আস, তত দিন আমি ফৌজদারকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি দুই চারি মাসের জন্য আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি অনেক কল কৌশল জানি।"

এই সকল বাক্যে সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

গমনকালে সীতারাম রাজ্য রক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময়, ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর; সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কান্নাকাটি একটু থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল, যে এসময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতরাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয়ত, তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে. নয়ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে. নয়ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে একরকম ভালই হইয়াছে। তবে কিনা, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল আর জন্মে দেখিবে।

কই মহম্মদপুরেওত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত. তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওযা যায় না, সৎমার কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেওত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াওত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, 'রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন্!'

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন; তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শত্রু সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও। আয়, পাশা খেলিবি। তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাজি হারিল--রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর একজনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা, আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার একজন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি।"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবাল বৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমান ভয়ে ভীত, কেহই মুসল-মানকে ভাল চক্ষে দেখে না—সকলই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে তোরাব খাঁ সম্বাদ পাইলেন যে সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময়ে মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সম্বাদও মহম্মদপুরে পৌছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিশীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুর বাড়ী, কেহ জামাই বাড়ী, কেহ বেহাই বাড়ী, বোনাই বাড়ী, সপরিবারে, ঘটি বাটি সিন্ধুক পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম রায়, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন,

"এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহরত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকে যাইতে দিবে না, যে যাইবে তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানি সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অদ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসিনা কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে, কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সম্বাদ পাইবেন, কখন কোন পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে। তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিগে অন্তঃপুরে সম্বাদ পৌঁছিল, যে তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সম্বাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধূম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিগে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা, তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ

মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ। তাঁরা যখন বলিতেছেন, ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা আর বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমত সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল "আমি যে হই" তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন করে না। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন, যে আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথা গুলা জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিল "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি তুমি স্ত্রীলোক এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ? আজ কাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে তাহা কি জান না?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে আমি কে?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে আপনি গঙ্গারাম রায় মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না আমিই জানিতাম না যে আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি? ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইবে? না আগুণ খাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তার অপেক্ষাও কঠিন কাজ। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেই খানে এখনই যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক সেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া, বলিলেন,

"এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে নাকি?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কেমন পাঁড়ে ঠাকুর দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়াছি। এ কে?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিলেন। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাড়ে। পুরুষ মানুষের যাইবার হুকুম নাই।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড় সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,

দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারির ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ; রজত পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক উজ্জ্বল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে. সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

সংসার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর বন্ধুগণ।

পরদিন প্রত্যূষে বিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গন ঝাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুখুরে বাসন মাজিতেছিলেন এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন সনাতনের স্ত্রী। বিন্দু বাল্যাবস্থায় তাহাকে কৈবর্ত্ত দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই। বলিলেন,

"কি কৈবর্ত্ত দিদি, এত সকালে কি মনে করে? তোর হাতে ও কি লো?"

সনাতনের পত্নী। "না কিছু নয় দিদি; মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধা দিদি চিনি পাতা দৈ বড় ভাল বাসে তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্য এনেছি। সুধা দিদি উঠেছে?"

বিন্দু। "না এখনও উঠে নাই। তা তোরা বোন্ গরিব লোক, রোজ রোজ দুদ দৈ দিস কেন বল দিকি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে ব'ন্?

স-প। "না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুদ বৈত নয়, তা দু এক দিন আন্‌নুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘর দোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিষ তোমরা খাবে না ত কে খাবে?"

বিন্দু। "তা দে ব'ন, এখন শিকেয় তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত্ত দিদি তুই বেশ দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভাল বাসে। ও কি লো? তোর চোকে জল কেন? তুই কাঁদ্‌চিস্ নাকি?"

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁ হুঁ হুঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অনুরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতন্বঙ্গী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলায় না! যাহা হউক কষ্টে চক্ষুর জল অপনীত হইল, কিন্তু সে ফোয়ারা একবার ছুটিলে থামে না, কৈবর্ত্ত রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁ হুঁ হুঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। "বলি ও কি লো? কাঁদচিস্ কেন লো? সনাতন ভাল আছে ত?"

স প। "আছে বৈকি, সে মিন্‌সের আবার কবে কি হয়? উঁ, হুঁ, হুঁ।"

বিন্দু। "তোর ছেলেটি ভাল আছে ত?"

স-প। "তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছা ভাল আছে।"

বিন্দু। "তবে সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌চিস কেন? কি হয়েছে কি?"

স-প। "এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিছ্‌নু গো তা সেখানে— উঁ হুঁ হুঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গাল দিয়েছে?”

স-প। “না গাল দেবে কে গা দিদি? কারউ কিছু খাই না কারউ কিছু ধারি যে গাল দেবে। তেমন ঘর করিনি গো দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিন্‌সে পোড়ামুখো হোক্, হতভাগা হোক্ গতর খেটে খায়, আমাকে খেতে পরতে দিতে পারে, আমরা গরিব গুরবো লোক কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?”

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামী-ভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিলেন, বলিলেন--

“তা তাইত ব’ন জিগ্‌গেস করচি, তবে তুই কাঁদচিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে নাকি?”

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুটী ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে যে কথা গুলি উচ্চারিত হইল তাহার মধ্যে এই মাত্র বোধগম্য হইল—

“ডেক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, সে আবার বল্‌বে! তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্ মুখে বল্‌বে? তার ঘর কর্‌চে কে? সংসার চালিয়ে নিচ্চে কে? আমি না থাক্‌লে সে কোন্ চুলোয় যেত? বল্‌বে! প্রাণে ভয় নেই”—ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হাস্য সম্বরণ করিয়া একটু তীব্র স্বরে বলিলেন,

“তবে তুই সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেলচিস কেন বলতো? তোর হয়েছে কি?”

স-প। “না দিদি কিছু নয়, কিছু হয় নি, তবে ঘোষেদের বাড়ী আজ সকালে শুন্‌লুম, উঁ, হুঁ হুঁ।”

বিন্দু। “নে, তোর নেকরা করতে হয় কর ব’ন, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি, আমার বাসন কোসন সব মাজতে পড়ে রয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটী উঠ্‌লেই দুদ চাইবে।”

এইরূপ কথা হইতে হইতে সুধা প্রাতঃকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রঞ্জিত বদনে, চক্ষু দুটী মুছিতে মুছিতে শয়ন ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বলিলেন—

"এই যে সুধা উঠেছে, এত সকালে যে ?"

সুধা। "দিদি আজ খুব সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখিলাম, সেজন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

বিন্দু। কি স্বপ্ন ?"

সুধা "বোধ হোলো যেন আমরা ছেলেবেলার মত আবার শরৎ বাবুর বাড়ী পেয়ারা খেতে গিয়াছি। যেন তুমি পেড়ে পেড়ে খাচ্চ, আর শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়ারা পাড়িয়া দিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন, আমিও পড়ে গেলুম। উঃ এমনি লেগেছে।"

বিন্দু। "সে কি লো! স্বপ্নে পড়িয়া গেলে কি লাগে ?"

সুধা। "হেঁ দিদি, বোধ হল যেন বড় লেগেছে, শরৎ বাবু যেন গাছতলায় সেই গর্ত্তটাতে পড়ে গেলেন।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আহা! এমন দুরবস্থা। আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পায়ে বেথা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করিব এখন! পা টা ভেঙ্গে যায়নি ত ?"

সুধা। "না দিদি ভেঙ্গে যায়নি।"

বিন্দু। "তুমি কেমন করে জান্‌লে।"

সুধা। "আবার যে তখনই উঠিয়া আবার আমাকে নিয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগ্‌লেন।"

বিন্দু উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "সাবাস ছেলে বাবু! আজ তাঁকে তাঁহার গুণের কথা বলিব এখন।"

হাস্য সম্বরণ করিয়া পরে বলিলেন, "সুধা, কৈবর্ত্তদিদি তোমার জন্য আজ চিনিপাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে এখন। দৈখানা শিকের ঝুলিয়ে রেখে এসত ব'ন। আর যখন উঠেছ, ঘাটে খানকত বাসন আছে মেজে নিয়ে এসত ব'ন। আমি উনুন ধরাইগে, এখনই ছেলেরা উঠবে।"

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হাস্যবদনে ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্নাঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়

কৈবর্ত্তপত্নী আর একবার চক্ষুর জল অপনয়ন করিয়া একবার গলা সাড়া দিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"বলি দিদিঠাকরুণ, কথাটা কি সত্তি ?"

বিন্দু। "কি কথা লো ?"

স-প। "এ যা শুন্‌লুম ?"

বিন্দু। "কি শুন্‌লি রে ?"

স-প। "তবে বুঝি সত্তি। আহা এতদিন পরে এই কি কপালে ছিল ! আহা সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়"—এবার অবারিত ক্রন্দনের রোল উঠিল, কৈবর্ত্ত সুন্দরীর সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীরখানি—যাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও সশঙ্কচিত্তে পূজা করিতেন,—সেই শরীরখানি ক্রন্দনের বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, ঈষৎ ভূমিকম্প তিনি বোধ করিয়াছিলেন কি—না জানি না, কিন্তু কৈবর্ত্ত সুন্দরীর তারস্বর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন নিদ্রা আর অসম্ভব। তিনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন,

"বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

বিন্দু। "ও কেউ নয়, কৈবর্ত্তদিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে তাই মনের দুঃখে কাঁদ্‌চে ?"

হেমচন্দ্র বলিলেন " কেও সনাতনের স্ত্রী, কেন কি হয়েছে গা, বাড়ীতে কোনও অমঙ্গল হয়নি ত, কোনও ব্যারাম সেরাম হয়নি ত ?"

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া, কাপড়খানি টানিয়া কষ্টে সৃষ্টে কোনও রকমে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া, ঢিপ্ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া, আবার গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া, আবার চক্ষুর জল মুছিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন,

"না গো কিছু অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুনিলাম তাহা দিদি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

বিন্দু। "আর সেই কথাটা কি আমি এক দণ্ড থেকে বার করতে পারলুম না! তুমি পার ত কর।"

হেম। "না মেয়ে মানুষদের কথা মেয়ে মানুষেই বুঝে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। "ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনিয়ছি তাই ঠিক!"

বিন্দু। "বলি তোকে আজ কিছু পেয়েছে নাকি, তুই অমন করচিস কেন, আবার কান্না, কেন কি শুনেছিস বল না।"

স-প। "ঐ যে শরৎ বাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুনুনু।"

বিন্দু। "কি শুনলি।"

স প। "তবে বলি দিদি ঠাকরুন, গরিবের কথায় রাগ করো না,। সত্যি মিথ্যে জানি নি, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর চাকর মিনসে আমাকে বল্লে, মিনসের মুখে আগুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করচে, দিদি-ঠাকরুণ একবার হাত দিয়ে দেখ।"

বিন্দু। "আমার দেখবার সময় নেই আমি কাজে যাই" বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত্তবধূ বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল,

"না দিদি রাগ করিও না, তোমাদের জন্য মনটা কেমন করে তাই এনু, না হলে কি অন্যের জন্যে আসতুম, তা নয়, আহা সুধাদিদিকে এক দিন না দেখলে আমার মনটা কেমন করে। (বিন্দুর পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ।) না না বলছিনু কি, বলি ঐ ঘোষেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিনসে বল্লে কি,—তার মুখে আগুন, তার বেটার মুখে আগুন, তার বৌয়ের মুখে আগুন, তার বাড়ীতে যেন ঘুঘু চরে। (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন।) না না বলছিনু কি, সেই মিনসে বল্লে কি, উঃ এমন কথা কি মুখে আনে গা, এও কি হয় গা, তোমাদের শরীরে মায়া দয়া ও ত আছে। (বিন্দুর রান্নাঘরের ভিতর গমন, সনাতন পত্নীর পশ্চাদগমন ও দ্বারদেশে উপবেশন।) না না বলেছিনু কি, সেই হতভাগা চাকর মিনসে বল্লে কি না, দিদিঠাকরুণ তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কলকেতায়

চলে যাচ্চ? আহা দিদিঠাকরুণ তোমাকে ছেলেবেলা মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না? সুধাদিদি আমাকে এত ভাল বাসে, সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গা?"—রোদন।

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"হে লা কৈবর্ত্তদিদি এই কথা বল্‌তে এই এতক্ষণ থেকে এমন করছিলি? তা কাঁদিস কেন বল, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয় নাই, কেবল শরৎ বাবু কথায় কথায় কাল বলেছিলেন মাত্র। তা আমাদের কি যাওয়া হবে? সেখানে বিস্তর খরচ।"

স-প। "ছি! দিদি সেখানেও যায়। শুনেছি কলকেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত বিচার নেই, হিঁদু মুচুনমানে বিচার নেই—সে দেশেও যায়। তোমাদের সোণার সংসার এখানে বসে রাজ্জি কর। শরৎ বাবুর কি বল না, ওঁর মাগ নেই ছেলে নেই, উনি কালেজে পড়েন, দিদিঠাকরুণ! কালেজের ছেলে সব কর্‌তে পারে। শুনেছি নাকি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ওমা! তারা ত জেন্ত মানু-ষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা সাগরের গপ্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়। শুনেছি নাকি নঙ্কায় যেতে হয়"।

বিন্দু। "হেঁ লো কত সাগর পার হয়ে তবে বিলেত যায়। শুনেছি লঙ্কা পেরিয়েও অনেকদূর যায়।"

স প। "ও বাবা, সে গঙ্গাসাগরের যে ঢেউ শুনেছি তাতে কি আর মানুষ বাঁচে? তা নঙ্কা থেকে কি আর মানুষ ফিরে আসে তারা রাক্কস হয়ে আসে, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কায নেই, কলকেতা গিয়েও কাজ নেই—তোমরা ঘরের নক্ষী ঘরে থাক। তবে এখন আমি আসি দিদি।"

বিন্দু দুদ জ্বাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এস বোন।"

স-প। আর দৈথানি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো। আর সুধাদিদি কি বলে বলো।"

বিন্দু। "বলবো দিদি, বলবো।"

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কলকেতায় যাবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো করে থেক।"

বিন্দু। "তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নাই, যদি যাওয়া হয় তবে কয়েক মাসের জন্য, আবার ধান কাটার সময় আসিব। আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া জমি ঘর ছাড়িয়া, কোথায় গিয়া থাকিব?"

কৈবর্ত্ত-বধূ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল কি অদ্য প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে ছিল তাহা অমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের অধিকাংশ সুখ দুঃখের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র, প্রথম সূর্য্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গনে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল!

সেই দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধু বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা জমি ছিল, বাড়িতে অনেক গুলি গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ বেচিয়া সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধুকে লইয়া সে জমা জমি দেখিতে পারিল না, অন্য কাহাকে কোরফা জমা দিল, যাহা খজনা পাইল সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটী আছে মাত্র, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া উদর পূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ী ও পুত্রবধু সর্ব্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যারামের সময় যথা সাধ্য সংসারের কায করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফসল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু ধান্য পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন মিস্রি, কখন দুই একটী সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব

লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদ আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্বাস বাক্যতে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভাল বাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্না কাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, এবং তাহার পুত্রবধূকে একখানি পুরাতন সাড়ী দিয়া ঘরে পাঠাইলেন।

হরিমতি প্রস্থান করিলে তাঁতিদের একটী বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি বৌ দেখিতে কাল, তাহার স্বামী তাকে ভাল বাসিত না, এবং অতিশয় কাহিল, কায কর্ম্ম করিতে পারিত না, সে জন্য শাশুড়ীর নিকট সর্ব্বদাই গালি খাইত। গত শীতকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়া ছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্য তাহার শাশুড়ী প্রহার করিয়া ছিল। তাঁতি বৌ কাহার কাছে যাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে তাঁতি বৌকে ঔষধি কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেরোসিনের তেল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি বৌকে রোদে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি বৌ গৃহ কার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভাল বাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি বৌ না যাইতে যাইতে বাউরী পাড়া হইতে হীরা বাউরিনী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পালকী বয়, বেশ রোজকার করে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করিত। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন, সেই অবধি হেম বাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জেঠামহাশয়ের ভয়ে বাউরীর অত্যাচার কিছু কমিল, হীরা ও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটীকে নূতন একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে আনিয়া বলিল "মাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্ব্বাদে হাতে ২।৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ঘরের চালে খড় পড়েনি এবার চাল নূতন করে ছাইয়াছি, আর বাছার জন্যে কাটওয়া থেকে এই নূতন কাপড় কিনেছি।" বিন্দু শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার পর গ্রামের শশি ঠাকুরুণ, বামা সদ্গোপনী, শ্যামা আগুরিনী, মহামায়া গোবানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদের বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেরই বিন্দু অপেক্ষা দুপয়সা অধিক আয় আছে, ভরসা করি আমরা যখন একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, আমাদের জন্যও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব তখন যেন দুই একটি পরোপকারের পরিচয় দিয়া যাইতে পারিব কেবল ঈর্ষা, পরনিন্দা, এবং পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা "বড় লোক হইয়াছি" এই আখ্যানটি রাখিয়া যাইব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাল্যসহচরীগণ।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জেঠাইমার বাড়ীতে গেলেন, এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়াছেন কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিন পর তাঁহাদিগের পরস্পরে দেখা হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকালের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ দুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল যাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শান্ত শুষ্ক বদনে ও নয়নদ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে,

শীর্ণ হস্তে দুইগাছি ফাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটী মাদুলি। তাঁহার বস্ত্র খানি সামান্য, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটী খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, শ্বশুর বাড়ীর কায কর্ম্ম করিত, দুইবেলা দুইপেট খাইত, কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকিত।

বিন্দু বলিলেন, "কালী, আজ কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হইল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?"

কালী। "বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে, বে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্দ্ধমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?"

উমা। "কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমি ত প্রতিবার পূজার সময় আসি"।

কালী। "তা তোমাদের কি বল বন, তোমাদের ঢের লোকজন আছে, কায কর্ম্মের ঝন্‌ঝট নেই, পাল্কী করে চলে এলেই হল। আমাদের ত তা নয়, বিস্তর সংসার, অনেক কায কর্ম্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকর দাসী রাখা প্রথা নেই। সুতরাং আমরা কেউ আসিলে কায চল্‌বে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাযগুলি কত্তে বলে এসেছি। তা দু পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?"

বিন্দু। "তোমাদের জমিদারির শুনেছি অনেক আয়, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী ঘোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর দাসী রাখেন না কেন?"

কালী। "না দিদি আয় জেয়দা নাই, খরচ শুনেছি বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েছে শুনেছি,—তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ও সব কথা ঠিক জানিনি। আমাদের একখানা বাগান বাড়ী আছে, বাবু সেইখানেই থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কায কর্ম্মের কি জানবেন্? আমার শাশুড়ীরাই কায কর্ম্ম দেখেন শুনেন। ঝি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি কিছু ছুঁতে আছে? সুতরাং বৌয়েদেরই সব কত্তে হয়।"

বিন্দু। "তা তোমাদের ধার টার হয়েছে বন, তা খরচ একটু কমাও

না কেন? শুনেছি তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা টানা দেন, অনেক গাড়ী ঘোড়া রাখেন,—তা এ সব গুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আয় তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?''

কালী। "ওমা তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিষয় কর্ম্ম বুঝেন, আমি বৌ মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তাঁকে এ কথা বলবো গা? তবে কখন কখন যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন, আমার খুড়শাশুড়ীরা তাঁকে ঐরকম কথা দুই একবার বলেছিলেন শুনিছি।''

বিন্দু। "তা তিনি কি বলেন?"

কালী। "বলেন আমাদের ভারি বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্য্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদি বড়মানুষ বংশ বলিয়া তেমনি মর্যাদা, তা সাহেবদের খানা টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি সাহেবরাও তাঁকে বড় ভাল বাসেন, এই যে কত "কমিটী" বলে না কি বলে, বর্দ্ধমানে যত আছে, বাবু সবেতেই আছেন। আর এই রোগা শরীর তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী দুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব মহলে নাকি তাঁর ভারি মান।''

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামী-গৌরব বর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ভ্রূকুটী করিলেন।

বিন্দু। "আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?"

কালী। "আমার শাশুড়ী ত নেই, সুতরাং আমার তিন জন খুড়শাশুড়ীরাই গিন্নী। বড় যে সে ভাল মানুষ, প্রায় কোনও কথায় থাকে না, মেজই কিছু রাগী, সকলেই তাকে ভয় করে, বৌরা ত দেখলে কাঁপে। আহা সে দিন আমার খুড়তুতো ছোট জা রান্নাঘর থেকে কড়া করে দুদ আনতে পড়ে গিয়েছিল, গরম দুদে তার গায়ের ছাল চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার যত কষ্ট না হয়েছিল শাশুড়ির ভয়ে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজ খুড়শাশুড়ি ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনলে যে দুদ অপচয় হ'য়েছে—অমনি মুড়ো খেঙরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আহা এমনি বকুনি বকলে, বাপ মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হল। আহা কচি মেয়ে দশ বছর মাত্র বয়েস, ভয়ে তিন দিন ভাল করে ভাত খেতে পারে নি।''

উমা। "তা তোমাকেও অমনি করে বকে?"

কালী। 'তা বক্‌বে না, দোষ করলেই বক্‌বে, তা না হলে কি সংসার চলে?'

উমা। "তোমাকে যখন বকে তুমি কি কর?"

কালী। "চুপ করে কাঁদি, আর কি কর্‌বো বল?"

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা আমার গায়ে সহ্য হয় না।"

কালী। "তা হে বিন্দুদিদি শ্বশুরবাড়ীতে কেউ গাল দিলে আর কি করবে বল? একটী কথার জবাব দিলে আর পাঁচটী কথা শুনতে হয়। তা কায কি বাবু, শাশুড়ীই হউক আর ননদই হউক, কেউ দুট কথা বলে, চুপ করে থাকি, আবার তখনই ভুলে যাই। কথাত আর গায়ে ফোটে না, কি বল বিন্দু দিদি?"

বিন্দু। "তা বেস কর বন্, কথা বরদাস্ত কত্তে পারলেই ভাল, তবে সকলের কি আর বরদাস্ত হয়, তা নয়। আচ্ছা, তোমার ছোট খুড়্‌শাশুড়ীও শুনিছি নাকি রাগী?"

কালী। "হ্যাঁ রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে ত আর পারে না, রাগ ক'রে দু একটা কথা বলে আপনার ঘরের ভিতর খিল দিয়া থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনিয়ে দেয়। আবার মেজোর কিছু টাকা আছে কি না, সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়, ছেলেদের শিকিয়ে দেয় ছোটর ঘরে বোসে খেগে যা। তারা ছোটর ঘরে বোসে খায়, ছোটর ছেলেরা খেতে পায় না, ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দ্দমা তয়ের করেছে। ছোট কত ঝগড়া করলে, আমার ছোট দেওর আপনি বাবুর কাছে নালিশ করতে গেলেন, বাবু ও নিজে এক দিন বাড়ী আসিয়া তাঁর মেজ খুড়ীকে বুঝাইতে গেলেন, তা সে কথা কি সে শুনে? মেজোর বকুনি শুনে বাবু ফের গাড়ী করে বাগানে পালিয়া গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে মজুরদের দিয়ে সেই নর্দ্দামাটী করালেন তবে সে দিন রাত্রিতে জল গ্রহণ করলেন।"

উমা। "সব্বাস মেয়ে যা হউক।"

কালী। "বলবো কি উমা, বাড়ীতে যে ঝগড়া কোঁদল হয় তাতে ভূত ছেড়ে পালায়। তবে আমাদের সয়ে গিয়েছে, গায়ে লাগে না। আর আমি কারউ কথায় নেই, যে যা বলে চুপ করে থাকি, আবার ভুলে যাই, আমার কি বল?"

বিন্দু। "কালী, তোমার খুড়্‌শাশুড়ীরা ত সব বিধবা। তাদের বয়েস কত হয়েছে?"

কালী। "বয়েস বড় যেয়াদা নয়, বাবুর বয়স আর আমার বড় খুড়-শাশুড়ীর বয়স এক, মেজ আর ছোট বাবুর চেয়ে বয়সে ৫। ৭ বছরের ছোট। আমার শ্বশুর বাপের বড় ছেলে ছিলেন, তিনি আজ যদি থাকতেন তাঁর ৭০ বৎসর বয়স হত। তা তিনি হবার পর প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর আর কেউ হয় নাই, তার পর তাঁর তিনটী ভাই হয়। তাই আমার শাশুড়ীর যখন প্রায় ৩০ বৎসর বয়স, তখন আমার খুড়শাশুড়িরা ছোট ছোট বৌ ছিল, নতুন বে হয়েছে। তারই দুই এক বছর পর বাবুর প্রথম বে হয়।"

উমা। আর কালীদিদি, তোমার পিশ্‌শাশুড়ীও ঐ বাড়ীতেই থাকে না?"

কালী। হাঁ৷ থাকে বৈকি, দুই পিশ্‌শাশুড়ী, আর একজন মাশ্‌শাশুড়ী আছেন; তাঁরা তিনজনই বিধবা, তাঁদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীশাশুড়ীও আছেন, তিনি সধবা, কিন্তু তাঁর স্বামী পুব দেশে পদ্মাপারে চাকরী কত্তে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, সুতরাং মামী দুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে ছেলেদের বে হয়, আজ তিন চার বছর হল।"

উমা। "সে ছেলে দুটী কেমন, লেখাপড়া শিখেছে?"

কালী। "ছোট ছেলেটী ভাল, ইস্কুলে লেখাপড়া করে, বড়টা লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাবু সাহেবদের বোলে তাকে কি কায করে দিয়াছিলেন, তা সে আবার কতকগুলা টাকা নিয়ে পালায়। সবাই বল্লে ছেলেটাকে সাহেবরা জেলে দেবে, কিন্তু বাবু সাহেবদের অনেক বলে কয়ে ঘর থেকে লোকসান পুরণ করিয়া ছেলেটাকে রক্ষা করেন। ছেলেটা

বাড়ী থাকে না, রোজ মদ খায়, শুনেছি নাকি গাঁজাও খেতে শিখেছে, যখন বাড়ী আসে পয়সার জন্য বৌকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, বৌয়ের কান্না শুনে আমাদেরও কান্না পায়! তা বৌ পয়সা কোথা থেকে পাবে দুই একখানা গয়না টয়না বাঁধা রেখে দেয়, তা না হলে কি তার প্রাণ থাক্‌তো?"

উমা। "উঃ তবে তোমাদের মস্ত সংসার।"

কালী। "তাইত বল্‌ছিলুম উমা, তোমরা বড় মানুষের ঘরের বৌ, তিনটী জা তিনটী ঘরে থাক, শাশুড়ী রান্না বান্না দেখেন, তোমরা কাযের ঝন্‌ঝট্ কি বুঝ্‌বে বল? তোমার দেওর দুজন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকেতায় গিয়েছেন?"

উমা। "হেঁ তিনি এক বৎসর হইতে কলকেতায় আছেন, আমাকেও কলকেতায় নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মার কাছে নোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও বলেছেন এই জষ্টি কি আষাঢ় মাসে পাঠিয়ে দিবেন"।

কালী। "হেঁ শরৎ বল্‌ছিল তোমার স্বামী নাকি কোন্ বড় রাস্তার উপর মস্ত বাড়ী নিয়াছেন, অনেক টাকা খরচ করিয়া সাজাইয়াছেন; তাঁর নাকি সুন্দর সাদা ঘোড়ার এক জুড়ি আর কালা ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন গাড়ী ঘোড়া রাজা রাজড়াদেরও নাই। আবার নাকি কলকেতার বাইরে বড় বাগান কিনিবার কথা চলিতেছে, সেই বাগানও নাকি ইন্দ্রপুরী, তেমন ফল, তেমন ফুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্ব্বেলের মেজেওলা ঘর কলকেতায়ও কম আছে। উমা তুমি বড় সুখে থাকিবে"।

উমার বিম্ববিনিন্দিত সুন্দর সূক্ষ্ম ওষ্ঠে একটু হাস্য কণা দেখা গেল, উজ্জ্বল নয়ন দ্বয়ে যেন একটু ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কালীদিদি, যদি সাদা জুড়ী আর কাল জুড়ী আর মার্ব্বেলের ঘর হইলে সুখ হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু কপালের কথা কে বলিতে পারে?" সূক্ষ্মদর্শী বিন্দু দেখিলেন উমা ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পর উমা আবার বলিলেন "বিন্দুদিদি! আমাদের ছেলে বেলা এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল মনে পড়ে, সে আমাদের হাত দেখিয়াছিল মনে পড়ে"?

বিন্দু। "কৈ মনে পড়ে না"?

উমা। "সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে বড় তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে"!

কালী। "কৈ না, আমারও মনে নাই"।

উমা। "তবে বুঝি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল তাই আমার মনে আছে। ঠিক বার বৎসর হইল, এই বৈশাখ মাসে এক দিন এমনি সন্ধ্যার সময় এই খানে খেলা কর্‌ছিলুম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলটার ভিতর হইতে বাহির হয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগলুম, কিন্তু সন্ন্যসীটা কাছে আসিয়া বলিল, "ভয় নেই তোমরা পয়সা নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখ্‌ব"। আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পয়সা পেয়েছিলুম ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলুম। তখন সন্ন্যাসী খুসি হয়ে হাত দেখিয়া বল্লে 'মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেবোনা"। তখন কালী ও হাত দেখাইবার জন্য বাড়ী থেকে একটা পয়সা এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটী নিয়ে বল্লে "তোমার ধন টন হবে না, ভাল বংশের বৌ হবে"।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন "আর জটাধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করিলেন"?

উমা। "তাই বলছি। তোমার মা ঘাটে গিয়াছিল, এবং তাঁর কাছে পয়সা টয়সা বড় থাকিত না, সুতরাং তুমি সুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী রেগে গিয়ে বলিল 'মা তুমি আর কেন ওদের সঙ্গে আস্‌চ, তোমার ধন ও নেই, বংশ ও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে, আর কি"!

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিল ত। সন্ন্যাসীর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"!

উমা। "বিন্দু দিদি এখন তাই বল্‌ছ, তখন তা বলোনি, তখন তুমি কাঁদ্‌তে লাগিলে। তোমার মা পুখুর হইতে জল আনিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। তখন আঁচল দিয়ে তোমার চোখের জল

মুছিয়া বলিলেন. "তা হোক বাছা, বেঁচে থাক্ বে থা হউক, চির এইস্ত্রী হয়ে থাকিস, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস। বাছা ধন কুলে সুখ হয় না, ধন কুলে তোর কায নেই।" বিন্দুদিদির সেই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হইলেই যদি সুখ হইত তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকিত না"।

বিন্দু। ও কি ও উমা, তুমি ছেলেবেলা কার একটা কথা মনে করে চখের জল ফেলছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাববে, তবে আমরা কি করব"।

উমা। "না দিদি আমার কষ্ট কিছুই নাই, আমার কষ্ট আছে বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি না। কিন্তু জানিনি কেন এই কলিকাতায় যাব বলিয়া, কয়েক দিন থেকে মনে অনেক সময় অনেক রূপ ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবান্ই জানেন। তা বিন্দুদিদি, তুমিও কলকেতায় যাচ্চ, আর কালীদিদি বর্দ্ধমানে আছেন সেও কলকেতা থেকে শুনেছি ৩।৪ ঘণ্টার পথ; আমরা ছেলে বেলা যেমন ভিন বনের মত ছিলুম যেন চির কাল সেইরূপ থাকি, আপদ বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভগ্নীর মত জ্ঞান করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করি"।

উমার সহসা মনের বিকার দেখিয়া বিন্দু ও কালীর মনও একটু বিচলিত হইল, তাঁহারা আঁচল দিয়া উমার চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পর হেমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল আত্মীয়া কুটুম্বিনী ও

বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তালপুকুরে সেদিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যূষে বিন্দু আর একবার জেঠাইমার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিন্দুর জেঠাইমা বিন্দুকে সত্যই স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিলেন, বলিলেন,

"বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের মত, আমার উমাও যে বিন্দু সুধাও সে, আহা তোদের হাতে করে মানুষ করেছি, তোদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে। তা যা বাছা যা, ভগবান্ করুন, হেমের কলকেতায় একটী চাকুরি হউক, তোরা বেঁচেবর্ত্তে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়বে। বাছা উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাকেও নাকি কলকেতায় নিয়ে যাবে, এই জষ্টিমাসে নিয়ে যাবে বলে আমার জামাই পেড়াপিড়ি কচ্ছে। সে নাকি শুনলুম কলকেতায় নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে, গাড়ী ঘোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শরৎ সে দিন বলেছিল তেমন গাড়ী ঘোড়া নাকি সহরে নেই। তা ধনপুরের জমিদারের ঝাড় হবে না কেন বল? অমন টাকা, অমন বড়মানুষি চালচোল ত আর কোথাও নেই। ঐ ও মাসে আমি একবার বেনের বাড়ী গিয়েছিলুম, বুঝলে কিনা, তা এই নীচে থেকে আর তেতোলা পর্য্যন্ত সব বেলওয়ারীর ঝাড় টাঙ্গিয়েছে। আর লোক, জন, জিনিস পত্র সে আর কি বলব। সে দিন প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে খাইয়াছিল, বুঝলে কি না, তা সবাইকে রূপর থাল, রূপর রেকাবী, রূপর গেলাস, রূপর বাটী দিয়েছিল! আর আমার বেনের কথাবার্ত্তাই বা কেমন। তারা ভারি বড় মানুষ, তাদের রীতিই আলাদা। এই আমার জামাইও শুনেছি নতুন বাড়ী করে খুব সাজিয়েছে, ঝাড়, লণ্ঠন, দেলগিরি, গালচে, মকমলের চাদর, বুঝলে কিনা, আর কত সোণা, রূপ, সাদা পাথরের সামগ্রী তার গোণাগুন্তি করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখবে বাছা, আমি চখে দেখিনি, তবে কলকেতা থেকে একজন লোক এসেছিল সেই বল্লে যে * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক, আমার উমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, দুটি বনের মত থেকো। আহা বাছা তোদের নিয়েই আমার ঘরকন্না,

তোদের না দেখে কেমন করে থাকব। (রোদন) তা যা বাছা, বাছা উমাও শীগ্গির যাবে, তার সঙ্গে দেখা করিস, না হয় তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন কত রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়, শুনিছি সে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর দরজা, বুঝলে কি না * * ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার শরতের মার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাইয়া অবধি তাহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকিতেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটী ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বামনী রাখিবার কথায় শরতের মাতা কোনও প্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটী প্রশস্ত, বাহির বাটীতে একটী পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেই খানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতরও দুই তিনটী পাকা ঘর ছিল আর একটী খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটী মধ্যমাকৃতি পুখুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর আর শরীরের যত্ন লইতেন না, সুতরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে কি গ্রীষ্মে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, এবং একখানি নামাবলি ভিন্ন অন্য উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আহ্নিক করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে, ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল এবং মাথার চুল অনেকগুলি শুক্ল হইয়াছিল, এবং অকালে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত দিন দেব আরাধনায় ও পরমাত্মিক চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, এবং কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান্ ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশয় জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র ও বিন্দু ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "যাও বাছা, ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হউক, এইটী চক্ষে দেখিয়া যাই, আমার এ বয়সে আর কোনও

বাঞ্ছা নাই। দেখিস বাছা শরৎ, এদের খাওযা দাওয়ার কোনও কষ্ট না হয়, বিন্দুর দুটী ছেলের যেন কোনও কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।”

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধব্য যাতনা জানিতেন, এই জ্ঞানশূন্যা অল্পবয়স্কা বালিকাকে ভগবান্ কেন সে যন্ত্রণা দিলেন?

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতায় যাইয়া অতি সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় লইলেন। শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “মা, তোমার কথা-গুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হইব সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।”

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্য হৃদয়ে সেই পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন সনাতন কৈবর্ত্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে আপন জমিখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ সনাতন সজল নয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর এক-খানি চিনি পাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক বারণ করিল, কিন্তু কৈবর্ত্ত পত্নী তাহা শুনিল না, বলিল গাড়ীতে যদি জায়গা না হয় আমি হাতে করে বর্দ্ধ-মানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত দিয়া আসিব। সুতরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে নিয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া যাইতেই পছন্দ করিলেন। গরুর গাড়ী বড় আস্তে আস্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটী দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন, এবং তথায় রাঁধা বাড়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে কাছে বড় সুন্দর খাজা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎ

বাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা দিয়া সুধা শেষবার তালপুকুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইলেন।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটী অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠরী লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বণিকসম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অল্পব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবলশরীর বহুশ্রমী কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকুরির জন্য কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী পুত্র বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন; বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্ব্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মথুরা বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটীর পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাহাদিগের সম্মুখে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকুরি করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেহ বা মুমূর্ষু আত্মীয় বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য, কেহ ধন মান, পদ বা যশঃ লিপ্সায়, কেহ বা জীবনের সায়াহ্নে কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম্মদেবীর একটী প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির আগমন পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল। শরৎ একখানি গাড়ী করিলেন, এবং সকলেই গাড়িতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবক্ষে গৃহতুল্য অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অপর পার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চিনাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল, তথায় শরতের কিছু কাপড় চোপড় কিনিতে ছিল তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল। বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুখুর হইতে বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা তিনতল দোকানে পথ প্রায় অধিকার করিয়াছে। কত দেশের কত প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, বিলাতি থান, দেশী কাপড়, বারাণসী সাটী, বম্বের কাপড়, মসলী-পত্তনের ছিট, ফ্রান্সের সাটীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা স্থানের গালিচা চাদর ছিট, পরদা ও সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে, খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা, সারি সারি খাবারের দোকানে এখনও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তক শ্রেণী। শিল, যাহা একখানা কিনিলে গৃহস্থের তিনপুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখিলেন, লোহার কড়া বেড়ী ঝাঁঝরি প্রভৃতি দ্রব্যতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কোথাও চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছে। কাঁচের দোকানে ঝাড়, লণ্ঠন, পাত্র, গেলাস, খেলানা, লেম্প প্রভৃতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কাষ্ঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ দ্রব্যাদি পালিস করি-তেছে, ছবির দোকানে কড়িকাট ও দেয়াল ছবিপূর্ণ, বাক্সের দোকানে কাঠের বাক্স, টিনের বাক্স, চামড়ার বাক্স, লোহার বাক্স, কত প্রকার দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য দেখিলেন তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন না। লোকজনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী চলিতে পারে না, মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারি দিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ,

খরিদ্দারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চিৎকার ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একি বিশাল মনুষ্য সমুদ্র! এত লোক কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়। অদ্য তালপুখুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্য সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহানগরীর কোনও নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চিনাবাজার হইতে বাহির হইয়া লালদিঘির নিকট গিয়া পড়িল, তথায় যাইবার সময় তিনি প্রাসাদ তুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সকল দোকান কাপড়-ওয়ালার দোকান বা জুতাওযালার দোকান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা এক্ষণে ভারত-সমাজের নিম্নস্তর, জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের প্রধান হেতু!

বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌরঙ্গিতে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এক্ষণ মর্ত্ত্যে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা বরুশ, ফেটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডন গার্ডেনে সমাগত হইতেছে। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান-ক্ষমতার অধীন হইয়া নর নারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে! ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুখুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট সুপ্ত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শরৎ বড় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটী ধারণ করিয়া নিস্তব্ধে পথ ও হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তব্ধ তালপুখুর ত্যাগ করিয়া তিনি অদ্য এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সদাচঞ্চল মনুষ্য সমুদ্রের কোনও নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বড় বাজার।

বিন্দু। ‘ও সুধা, সুধা, একবার এদিকে এসত বন।”

সুধা। “কি দিদি, আমাকে ডাকৃছ?

বিন্দু। “হেঁ বন, ঐ কাপড় কখানা কেচে রেখেছি, ছাতের উপর শুকুতে দাও ত। আমি কুয়ো থেকে দু কলসী জল তুলে শিগ্গির নেয়ে নি; রোদ উঠেছে, এখনি গয়লানী দুদ আনবে, উনুন ধরাতে হবে। কলকেতার কুয়োর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়াগেঁয়ে পুখুর ভাল, বেশ নেবে স্নান করা যায়। আর কুয়োর জলে কেমন একটা গন্ধ।”

সুধা হাসিয়া বলিল “তোমার বুঝি কলকেতার সবই খারাব লাগে? কেন কল্‌কেতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি খাবার জন্যে এক কলসী ক’রে আনে, সে যেন কাগের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।”

বিন্দু। “নে বন, তোর কলকেতার সুখ্যেত আর শুনতে পারি নি।”

সুধা। “কেন দিদি, তুমি মন্দ কি দেখ্‌লে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া, লোক, জন, এমন কি আমাদের তাল-পুখুরে আছে? এমন দোতলা বাড়ী কি আমাদের তালপুখুরে আছে?”

বিন্দু। “তা না থাকুক বন, আমাদের তালপুখুরের সোণার বাড়ী। চার দিকে নড়বার চড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটা লাউ গাছ আছে, দুটা আঁব গাছ আছে, এখানে কি আছে বল তো? গাড়ী ঘোড়া যাদের আছে তাদের আছে, আর দোতলা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ার লোকের বাড়ী দেখা করতে যাবার যো নেই, পাল্কী না হলে বাড়ীর বাইরে যাবার যো নেই,—ও মা এ কি গো? যেন পিঞ্জরের ভিতর পাখী রেখেছে!”

সুধা। "কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী করে কত বেড়িয়ে এলুম, চিড়িয়াখানায় বাগ সিংগি দেখে এলুম, গাড়ী করে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।"

বিন্দু। "না বাবু, আমার গাড়ী করে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমামাদের তালপুখুর সোণার তালপুখুর, সকালবেলা পুখুরের ঘাটে নেয়ে আসতুম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিনতুম, সবার বাড়ী যেতুম, সবাই কত আমাদের ভাল বাসত। এখানে কে কাকে চেনে বল?"

সুধা। "তা দিদি এক দিনেই কি চিনবে, থাকতে ২ সকলকে চিনবে। ঐ সে দিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের খেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের কাল কত খাবার দাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

বিন্দু। "তা আলাপ হবে বৈকি বন, যত দিন থাক্‌ব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড় লোক, আমরা গরিব মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কলকেতায় যখন এসেছি তখন দুজন চার জনের সঙ্গে কি চেনা শুনা হবে না, তা হবে বৈকি।"

সুধা। "আর শরৎ বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন,—দিদি, সে গপ্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।"

বিন্দু। "আহা শরতের মত কি ছেলে, আজ কাল আর দেখা যায়? তার একজামিনের জন্যে সমস্ত দিন পড়াশুনা করতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি জিগ্‌গেস কর্‌তে আসেন, পাছে কলকেতায় এসে আমাদের মন কেমন করে তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলুম তত দিন ত তাঁর পড়াশুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁর টাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নাই, আর শরীরে কত মায়া দয়া। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?"

সুধা। "দিদি, ঐ বুঝি গয়লানী আসচে!"

বিন্দু। "কি লো, আজ একটু ভাল দুদ এনেছিস, না কা'লকের মত জল দেওয়া দুদ এনেছিস? তোদের কলকেতায় বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের দুদের ও অভাব নেই, রংটা রাখতে পরলেই হল!"

গোয়ালিনী। "না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুদ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? তোমরা ত খেলেই ভাল মন্দ বুঝতে পারবে।"

বিন্দু। "দেখিছি বাছা দেখিছি; আহা তালপুখুরে আমরা তিন পো, একসের করে দুদ পেতুম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠতে পারত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে দুদ দিস তা খেয়ে ছেলেদের পেট ভরে না। আর কড়ায় যখন দুদ ঢালি, সে দুদ ত নয় যেন জল ঢালছি।"

গো। "তা পড়াগাঁয়ে যেমন দুদ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে। সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুদ দেয় ভাল। আমাদের বাঁদা গরু কি তেমন দুদ দেয়?"

বিন্দু। "আর কাল যে একটু দৈ আন্‌তে বলেছিলুম, তা এনেছিস?"

গো। "হেঁ এই যে এনেছি"

বিন্দু। "ও মা! ঐ চার পয়সার দৈ?"

গো। তা, হেঁ গা, চার পয়সার দৈ আর কত হবে গা। ঐ তোমার ঝিকে বল না বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে তবে দাম দিও না। হে মা, তোমাদের পিত্তেশে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব গা?"

বিন্দু। "ওলো সুধা, এই দেখ লো, তোর সোণার কলকেতার চার পয়সার দৈ দেখ! একটু জল মেখে খাস বন, তা না হলে ভাতে মাখতে কুলোবে না! কে ও ঝি এসেছিস।"

ঝি। "কেন গা?"

বিন্দু। "বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস ত। আজ বাবু দশটার সময় বেরবেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার করে আসিস ত। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস তার ঠিক নেই। হেঁ লা বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না?"

ঝি। "তা পাওয়া যাবেনা কেন মা, তবে যে দর সে কি ছোঁয়া যায়? বড় বড় কৈ এক একটা দুপয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়"।

বিন্দু। "বলিস কিবে? কলকেতায় লোক কি খায় দায় না, কেবল গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়ায়"?

ঝি। "তা খাবে না কেন মা, যে যেমন খরচ করে সে তেমনি খায়। আমাদের দিন চার পয়সার মাছ আসে তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায়"?

বিন্দু। "আচ্ছা মাগুর মাছ"?

ঝি। "ওমা মাগুর মাছের কথাটি কইও না, একটি বড় মাগুর মাছের দাম চার পয়সা, ছ পয়সা, আট পয়সা। বলব কি মা, কলকেতায় বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগাঁয়ে ঘর করেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কলকেতায় কি তেমনি পাই? কলকেতায় কি আমাদের মত গরিব লোকের থাকবার জো আছে মা,—এই তোমরা দুবেলা দুপেট খেতে দিচ্চ তাই তোমাদের হিল্লতে আছি, নৈলে কলকেতায় কি আমরা থাকতে পারি"?

বিন্দু। "তা নে বাছা, যা ভাল পাস নিয়াসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে ভাল দেখে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস একটু অম্বল রেঁদে দিব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি তাই ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্, সাগ যদি ভাল পাওয়া যায় ত এক পয়সার আনিস ত, নটে সাগ হয়, কি পালম সাগ হয়, না হয় নাউ সাগ হয় ত আরও ভাল। আহা তালপুকুরে আমাদের নাউ সাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ সাগ হত তা খেয়ে উঠতে পারতুম না। আলুগুন বড় মাগ্গি, আলু জেয়দা আনিস নি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি ঝিঙ্গে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারি যা দেখবি নিয়ে আসিস। আর থোড় পাসত নিয়ে আসিসত, একটু ছেঁচকি করে দিব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস, একটু ঘন্ট রেঁদে দিব। হা কপাল! থোড়, মোচা আবার পয়সা দিয়ে কিনতে হয়!"

স্নান সমাপন করিয়া গয়লানীকে বিদায় করিয়া ঝিকে পয়সা দিয়া বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং উনান জ্বালাইয়া দুদ জ্বাল দিয়া উপরে

লইয়া গেলেন। ছেলে দুটী উঠিয়াছে, তাহাদের দুদ খাওয়াইয়া বিছানা মাদুর তুলিলেন এবং ঘর পরিষ্কার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারি আনিল, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটীকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধন ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটী দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধন কার্য্য দুই ভগিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। সুধা নূতন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হয়েছেন, বড় আহ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে নুন তেল মসলা বাহির করিলেন, চাল ধুয়ে দিলেন, তরকারি কুটিলেন, মাছ কুটিলেন, এবং আবশ্যকীয় বাটনা বাটিয়া দিলেন। বিন্দু শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে হেমচন্দ্র কয়েক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাটীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোনও প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অনুসন্ধান করিয়া মাসে ১১টাকা ভাড়ার একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভাবানীপুরে শরৎ বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের সঙ্গে আলাপ ছিল, হেমচন্দ্র ও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, কেহ বড় হৌসের বড় বাবু, কাহার ও বনিয়াদি বিষয় আছে, কাহারও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সদ্বংশজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিলেন, কেহ বা ঝাড় লাণ্ঠান-পরিশোভিত জনাকীর্ণ বৈটক্‌খানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটী সগর্ব্ব কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন, এবং নিজ বড়মানুষি প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মানুসারে হেমচন্দ্রের "একোয়েণ্টান্‌স ফরম" করিতে "ভেরি হ্যাপি" হইলেন। কোন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত বড় লোকের কার্পেট মণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাৎ-

মৃত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্য কোন বড় লোক, তিনিও বিষয় কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ী করিয়া বাহির হইবার সময় ক্রহমের জানলার ভিতর হইতে সহাস্য মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সানুগ্রহ বচনে জানাইলেন যে হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া, তিনি (উপরিউক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন, অদ্য তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) বড় "বিজি," কিন্তু তিনি "হোপ" করেন শীঘ্র এক দিন বিশেষ আলাপ সালাপ হইবে। আর যদি হেম বাবু তাঁহার (উপরি উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন তবে শনিবার অপরাহ্ণে আসিতে পারেন, সেখানে বড় "পার্টি" হইবে, তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) হেম বাবুকে "রিসিভ" করিতে বড় "হ্যাপি" হইবেন। ঘর ঘর শব্দে ক্রহম বাহির হইয়া গেল, অশ্ব ক্ষুরোদ্ঘাত কর্দ্দম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক ফোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃত বচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরের ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন কলিকাতার বড় বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন বড় বাজার হইতেও বড় একটী কলিকাতার বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদমজাৎ আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন সম্মানামৃত সেরকরা, মনকরা, বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ ভারি খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেন পার্টী দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহবা পরের ধনে হস্ত প্রসারণ করিয়া, সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন, ও বড় সুখে, নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, সুবর্ণ বর্ণ সুধার সহিত সে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে

সে অমৃত প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে! কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর শব্দে সেই অমৃত নিস্থত হইতেছে, কখন অসলারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে! আর কখনও বা অবারিত বেগে কর্ত্তপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাবতীয় বড় লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারি ভারি দেশের মহামান্যগণ পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক্" করা, "হর্মেটিকেলাসীল" করা বাক্সে বাক্সে সে মাল আমদানি করা হইতেছে, দুই এক খানি কাঁপা বা গিল্টী করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রিত করিয়া বিলাতি মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানি করিতেছেন! এ বাজারে সে মালের দর কত! "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পত্র।" "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!" এই গৌরব ধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথাও "দেশহিতৈষিতা," "সমাজ সংস্কার," প্রভৃতি বিলাতি মাল বিলাতিদরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌনসিল হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা, বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন রাজমিস্ত্রিরা অনবরত মেরামত করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্যরূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতাগণ বড় বড় জয় ঢাক বাজাইয়া চিৎকার করিতেছে "আমাদের এ খাঁটী দেশী মাল, ইহার নাম "সমাজ সংরক্ষণ," ইহাতে বিলাতি মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ।" হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন মালটা ষোল আনা বিলাতি, বিলাতি পাত্রে বিক্রিত, বিলাতি মালমসলায় প্রস্তুত, কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভেজে নেওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখিন, তাঁহার বোধ হইল ঘিটাও ভাল

খাঁটি দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা, ও দুর্গন্ধ! সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী" মাল বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া সেই মাল বিক্রিত হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতেপারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে।

তাহার পর সাধুত্বের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার,—হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্ব শাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়, এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশি নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটী জালা ফাসিয়া গেল, পথ ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল. পিপিলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! কলিকাতার কি মাহাত্ম্য,—এমন জিনিসই নাই যাহা খরিদ বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদমজাত হইয়াছে. মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন বোর্ড" সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড় বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাটতি, চতুরতায় বিশেষ মুনফা, চতুরতায় জগৎ সংসার ধাঁদা লাগিয়া রহিয়াছে!

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটি মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটি দেশ হিতৈষিতা, একটু খাঁটি পরোপকারিতা, বা একটু খাঁটি পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড় বাজারে সে মালের আমদানি

রফতানি বড় অল্প, সুসভ্য মহা সম্ভ্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতায় কোন কার্য্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয়মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন; তথাপি যখন কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন তখন কর্ম্ম পাইবার জন্য যত্নের ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনও উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে এই অনন্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী!

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত সহিষ্ণু বিন্দু স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, দুখানি আক্, দুটী পানফল, চারটী মুগের ডাল, এক গেলাস মিস্রির পানা সযত্নে আনিয়া দিতেন, প্রফুল্ল চিত্তে মিষ্ট বাক্য দ্বারা হেমচন্দ্রের শ্রান্তি দূর করিতেন। পল্লিগ্রামেও যেরূপ ভবানীপুরেও সেইরূপ, স্বামী-সেবাই বিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম, ছেলে দুটীকে মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। সেই কার্য্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুইটীকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন, কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচিরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনস্রোত দেখিতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক ম্লান।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়ন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন! হেম চন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন তাহাই বলিতেন, শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প নানা কথা, সংসারের সুখ দুঃখের কথা, জগতে ধন ও দারিদ্রের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন. তাঁহার নবীন বয়সের উৎসাহ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই কথায় দেদীপামান হইত, জগতের প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প করিতে করিতে শরৎ চন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইত, জগতের প্রতারণা মিথ্যাচরণ বা অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্জ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহের সহিত সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাল্য সুহৃদের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন সে কথা সর্ব্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার "বড় বাজারের" মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মনুষ্য হৃদয়ের প্রধান গুণ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সদ্‌গুণ গুলির নামে তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণা কার্য্য হয় তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লিগ্রামে প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!"

শরৎ। "আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড়

প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সদ্‌গুণ কলিকাতায় পান নাই; প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা, সত্যাচরণ, বিদ্যানুরাগ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ মনুষ্য হৃদয়কে উন্নত করে, সে গুলি কি আপনি দেখেন নাই"?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশানুরাগ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়দিগের হিত সাধন জন্য অনন্ত চেষ্টা, অনন্ত উদ্যম, জীবন ব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লিগ্রামে কখনও দেখি নাই; পুস্তকে ভিন্ন অন্য স্থানে লক্ষিত করি নাই। বিদ্যানুরাগও সেইরূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত, মধ্য বয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত অনন্ত অবারিত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবন পণ করিয়া সৎকার্য্যের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লিগ্রামে কোথায় দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ আমি কলিকাতায় শত শত সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটী সদ্‌গুণ আছে, সেইখানে তাহার একশত প্রকার মিথ্যা অনুকরণ আছে,—যদি দশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী থাকেন, সহস্রজন দেশ হিতৈষিতার নাম লইয়া চিৎকার ও ভণ্ডামি করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজ সংরক্ষণে যত্নশীল, শতজন সেই সদ্‌গুণের নামে শতপ্রকার প্রতারণার দ্বারা পয়সা রোজগার করিতেছে। এইটী প্রকৃত দোষের কথা।

শরৎ। "সে দোষ তাহাদের না আমাদের? বিন্দুদিদি, তোমার এ মাদুরে ছারপোকা আছে?"

বিন্দু। "সে কি শরৎবাবু কামড়াচ্চে নাকি?"

শরৎ। "না কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করিতেছি আছে কি না।"

বিন্দু। "না শরৎবাবু আমার বাড়ীতে অমন জিনিসটী নেই। আমি নিজের হাতে প্রত্যহ বিছানা মাদুর রোদে দি, জিনিস পত্র ঝাড়ঝোড় করি। নোংরা আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি।"

শরৎ। "সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে

গিয়াছিলুম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়াছিল, তা তাদের মাদুরে এমন ছাবপোকা যে বসা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি?"

বিন্দ। "কারণ আর কি, নোংরা, অপরিষ্কার। জিনিস পত্র নোংরা রাখিলেই ঐগুলো জন্মে।"

শরৎ। 'বিন্দুদিদি, আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখিলেই তাহাতে প্রতারণাব কীটগুলা জন্মায়। আমরা যদি পরনিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমানীর মূর্খতায় মুগ্ধ হইয়া হাঁ করিয়া থাকি, সেই মূর্খতাই বিদ্যারূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিদ্যমান দেশ-হিতৈষিতায় যদি আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ দেশ-হিতৈষিতার ছড়াছড়ি হইবে। চিনেবাজারে যেরূপ কাপড় যখন লোকের পছন্দ হয়, সেইরূপ কাপড়ের সেই সময়ে অধিক মূল্য হয়, অধিক আমদানি হয়। আমাদেরও যেরূপ সদ্গুণে পছন্দ ও রুচি সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটী তাহাদের দোষ না আমাদের দোষ?"

বিন্দু। "আচ্ছা সে কথা বুঝিলাম। কিন্তু মাদুরে ছারপোকা হইলে মাদুর রোদে দিতে পারি, মসারি, বা বিছানায় কীট থাকিলে তাহা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হইলে তাহার কি উপায়? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায় না রোদে দেওয়া যায়?"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলো সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রিগুলি একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষায় সে ফল না ফলে তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওষ্ঠস্থ দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা মুগ্ধ না হই তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খতা দেখিলে যদি আমরা সাহস্যে তথা হইতে প্রস্থান করি তবে সে অদ্ভুত সামগ্রী কত দিন বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকি সামগ্রি যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয় সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।"

হেম। "শরৎ তোমার এ কথাটী আমি স্বীকার করিতে পারি না।

শুনিয়াছি ইউরোপে শিক্ষার অনেক বিস্তার হইয়াছে, শুনিয়াছি তথায় যে পিতা পুত্র কন্যাকে পাঠশালায় প্রেরণ না করে তাহার আইন অনুসারে দণ্ড হয়। কিন্তু তথায় কি বাহ্যাড়ম্বর বা প্রতারণা অল্প?"

শরৎ। "হেমবাবু, আমাদের দেশ অপেক্ষা তথায় অনেক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক শ্রেণী, অনেক সম্প্রদায় প্রকৃত শিক্ষা পায় নাই, সুতরাং সামাজিক প্রতারণার এখনও প্রাদুর্ভাব আছে। তথাপি তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায় যে গুণে মুগ্ধ হয়েন, যে লোককে প্রকৃত সম্মান করেন, সেই গুণের উৎকর্ষ, সেই লোকের মাহাত্ম্য একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। বিন্দুদিদি, আমি একটী গল্প বলি শুন।

ইংলণ্ডে একজন লোক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার কাল হইয়াছে। যশই বিদ্যালাভের প্রধান উত্তেজক, কিন্তু এই মহামতির যশের প্রতি এরূপ অনাস্থা ছিল, কেবল বিদ্যালাভের জন্যই এতদূর অনুরাগ ছিল; যে তিনি প্রায় বিংশ বৎসর পর্যান্ত ক্রমাগত প্রকৃতির জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে বিস্ময়কর নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলি মুদ্রিত করেন নাই, মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। জগৎ তাঁহার নাম শুনে নাই, তাঁহার আবিষ্কার জানিত না। তখনও তিনি অনন্ত পরিশ্রম, অনন্ত উৎসাহের সহিত আরও অনুসন্ধান, আরও বিদ্যাহরণ করিতেছিলেন, যশস্বী হইবেন এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই! কথাটী শুনিলে কাল্পনিক বোধ হয়, উপন্যাসযোগ্য বোধ হয়; জগতে প্রকৃত এরূপ লোক আছে জানিলে দেবতা বলিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা কি করি, এক ছত্র পদ্য, বা এক অধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইবার জন্য ভেরী বাজাইতে আরম্ভ করি, অন্নের জন্য একটী দেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়া ভারত উদ্ধার করিতেছি বলিয়া ঢাক বাজাই। এ কথাগুলি আমি কাহাকেও বলি না, অন্যে বলিলে আমার চক্ষে জল আসে, কিন্তু এ চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমাদের সমাজে কোথায় পাইব?"

বিন্দু। "তা সে পণ্ডিতের আবিষ্কার শেষে লোকে জানিল কিরূপে?

শরৎ। "শুনিয়াছি তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার আবিষ্কার জানিতে পারিয়া সেগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য অনেক জেদ করিলেন। তিনি অনেক প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, প্রকাশ করিবার যোগ্য হয় নাই, বলিয়া অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে সেগুলি প্রকাশ করিলেন।"

বিন্দু। "তখন সকলে বোধ হয় তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিল?"

শরৎ। "না দিদি, এক দিনে নহে। প্রথমে লোকে তাঁহাকে যেরূপ গালিবর্ষণ করিয়াছিল সেরূপ বোধ হয় শত বৎসরের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যে মনুষ্য কেবল বিদ্যালোচনায় জীবন পণ করেন তাঁহার পক্ষে গালিই পুষ্পাঞ্জলি! ক্রমে লোকে তাঁহার আবিষ্কারের মাহাত্ম্য দেখিতে পাইলেন, সম্প্রতি সেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মরিয়া গিয়াছেন,—অদ্য সভ্য জগৎ ডারউইনকে এ শতাব্দীর মধ্যে অদ্বিতীয় বিজ্ঞানাবিষ্কারী বলিয়া মানে।"

হেম। "কিন্তু ইউরোপে সকলেই কি ডারউইন?"

শরৎ। "বিদ্যায় ডারউইন অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার যে নিষ্কাম কর্ত্তব্য সাধনাভিলাষ ছিল, তাহা ইউরোপীয় সমাজে অনেকটা লক্ষিত হয়,—ইউরোপের উন্নতির তাহাই মূল কারণ। যে মহাধীশক্তিসম্পন্ন বিস্‌মার্ক এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মান সাম্রাজ্য নিজ হস্তে গঠিলেন, যে অদ্বিতীয় দেশানুরাগী গারিবল্ডী অসি হস্তে ইতালী স্বাধীন করিয়া পর দেশের উপকারের জন্য আপনি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া সেই রাজ্য অন্যকে দিলেন, ইংলণ্ডে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিখ্যাত,—সকলের জীবনচরিত্রে আমি সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন অনেকটা দেখিতে পাই। সামান্য লোকেও এই শিক্ষাটী শিখিলেই দেশের উন্নতি হয়, যে দেশের মিস্ত্রিরা কর্ত্তব্যানুরোধে মনিব না থাকিলেও একটু ভাল করিয়া কাজ করে, মুটে মজুরদেরও শিক্ষাগুণে একটু কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে, সেই দেশেরই ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিন্দুদিদি, ইউরোপে জর্ম্মান ও ফরাসী বলিয়া দুইটী পরাক্রান্ত জাতি আছে, পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা জর্ম্মানদিগকে বার বার যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি জর্ম্মানগণ ফরাসী-

দিগকে বড় হারাইয়া দিয়াছে। উভয় জাতিই সমান সাহসী, কিন্তু আমি একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকে পড়িয়াছি যে জর্ম্মানদিগের বিজয়ের প্রধান কারণ এই যে তথাকার অতি সামান্য সৈন্যগণ ও আধুনিক শিক্ষাবলে কর্ত্তব্যসাধনে সমধিক রত, প্রত্যেক সামান্য সিপাহি কর্ত্তব্যানুরোধে নিজ নিজ স্থানে কলের ন্যায় নিজ নিজ কর্ম্ম করে। যুদ্ধে যেরূপ সমাজেও সেইরূপ, কর্ত্তব্যসাধনই জয়ের হেতু। উপন্যাসে দেখিতে পাই এই কর্ত্তব্যসাধনের একটী সুন্দর প্রাচীন ফরাসী নাম ' Devoir',' ইংরাজেরা উহাকে এক্ষণে "Duty" কহে, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধনের যতদূর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কোনও দেশে লক্ষিত হয় নাই। সংসারে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে এই ধর্ম্মটী অবলম্বন করিতে পারি, কেবল কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি কার্য্য করিতে শিখি, নিজের বাঞ্ছা, নিজের অভিলাষ যদি একটু দমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে হৃদয় স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদিগের উন্নতির পথ দিন দিন পরিষ্কার হইবে।"

হেম। "শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষাগুণে সমাজ হইতে প্রতাবণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে এরূপ আমাব আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য-হৃদয়ে যতদিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্ম্মাচরণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে। তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধন বাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয় তাহা আমাদেরও বোধ হয়"।

বিন্দু। "তা আজ কাল তোমাদেব কালেজে যে লেখাপড়া হয় তাহাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, কলেজের শিক্ষাকে অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষায় আমরা মহৎ জাতিদিগের মহৎ লোক-দিগের জীবনচরিত ও কার্য্য-কলাপ অবগত হইতেছি, ও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মাবলী শিখিতেছি তাহা কি মন্দ শিক্ষা? যাঁহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না,—সে তাঁহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা প্রকৃত উন্নতি ইচ্ছার কথা

বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল অদ্য তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষাগুণে এই সদ্গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দিতেও আমরা বোধ হয় ইউরোপীয়জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না সন্দেহ; কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে জগদীশ্বরের কৃপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ, চেষ্টা, ও অধ্যবসায়ই এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি এক পা দুই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন বাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন "আমি কলেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ন্যায় প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে, শরতের ন্যায় উন্নতহৃদয় উন্নতচিত্ত, আনন্দনীয় উদ্যম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি।"

দেবীবাবু বলিলেন, "হেঁ ছেলেটী ভাল, গুণবান বটে, বেঁচে থাকুক, বাপের নাম রাখবে। আর লেখাপড়াও শিখ্‌বে বটে, কিন্তু ছেলে মানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায় তাই ভাবি।"

কৃষ্ণচরিত্র।

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমর-সাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক, এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

"রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপাল বধের ইহাই যথার্থ কারণ; শিশুপালকে বধ না করিলে, তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালি গালাজ করিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রচারের প্রথম খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই সময়ে উক্ত হয়; কিন্তু এইখানে

পাঠক ঐ খণ্ডের ৪১৫।৪১৬ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করুন। এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী। কোন্ সিদ্ধান্তটি সত্য তাহা মীমাংসা করা কঠিন। পূর্ব্বে বাল্যলীলার কিম্বদন্তী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে, ইহা আমাদিগের বোধ হইয়াছে। দুইটি বিরোধী কথা যখন মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার একটা প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব। যখন দুইটি কথার মধ্যে একটি অনৈসর্গিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় পূর্ণ, আর একটি স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত, তখন যেটি স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত সেইটিই বিশ্বাসযোগ্য। পাঠক যদি এ মীমাংসার যাথার্থ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাস বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।*

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন। "দুরাত্মা" "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার ও তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাস-যোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার পিতামাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু

* তিরস্করণ কালে শিশুপাল কৃষ্ণকে কংসের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে কৃষ্ণ মথুরায় প্রতিপালিত, নন্দালয়ে নয়।

করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।”

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়, কেন না উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন” কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসী মা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কানার কানাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুর বধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ

ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র রূপ রত্ন ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকত কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাতসাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, ততদিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যতদিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শপুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগ পর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা

করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

তারপর ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজাগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ কণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহুত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না। এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপাল কৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে, যে তিনি পিতৃস্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন,' এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিকও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃস্বস্পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সুসঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্য শরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল। চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না, যে তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের

সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র স্মরণ বৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ যুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে অর্জ্জুন শিশুপাল বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজ প্রমুখ নরেন্দ্র বর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।" ১২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষ যুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচর বর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে একগ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই, একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি

কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধে উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞ রক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

বেদ।

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ২১ শ্লোক।

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন অন্যান্য লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে এবং এই শ্রেষ্ঠ লোকেরা যাহা প্রমাণ করেন অন্যান্য লোকে তাহারাই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

সমাজের ভাব সকল কিরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সত্যতা বেশ বুঝা যায়। আমরা সাধারণ লোকে যে শ্রেষ্ঠ লোকের মনোভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি তাহা কোন কোন সময় জ্ঞাতসারে হই এবং অনেক সময় অজ্ঞাত সারে সেই সেই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি।

ভারতের আর্য্যসমাজ এক কালে ঋষিগণকে মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত এবং জ্ঞাত সারে এবং অজ্ঞাত সারে সেই সেই ঋষিগণের প্রমাণের অনুবর্ত্তী ছিল; কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই ঋষিগণকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া আর বুঝি না; হারবর্টস্পেন্সর, ডারউইন, ম্যাক্সমূলর, টিণ্ডল ইঁহারাই আজকাল আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য তাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে তাঁহারা যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি।

ঋষিগণ বেদকে মহাবাক্য বলিয়া বুঝিতেন, ভারতের প্রাচীন সমাজ ঋষিগণকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতেন, সেই জন্যই বেদ এতকাল ভারতে আদরণীয় হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজকাল ঋষিগণের মাহাত্ম্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঋষিচিত্তের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আর আমাদের নাই; এখন যাঁহাদের চিত্তের উৎকর্ষ আমরা ধারণা করিতে পারি তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিগণের কথা মনে লাগে না সেইজন্য এই সকল পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ করিতেছেন আমরাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি।

আমরা হার্ব্বার্ট স্পেন্সর, ডারউইন, কোমৎ ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির চিত্তের অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিচিত্ত অবস্থা যে এইরূপ অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থা তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ঋষিগণ বেদকে যে ভাবে দেখিতেন আমরা বেদকে সে ভাবে দেখিতে ভুলিয়া গিয়া, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে দেখেন আমরাও বেদকে সেইভাবে দেখিতে শিখিতেছি।

বেদ সত্যমূলক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, বেদভিত্তি অবলম্বনেই হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে—এইরূপ কথা চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; এই কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা যদি কেহ পক্ষপাতশূন্য হইয়া অনুসন্ধান করিতে চান তবে বেদপ্রণেতা ঋষিগণ এবং যে সকল ঋষিরা বেদভিত্তি অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম গড়িয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত কতদূর উন্নত ছিল তাহার

আলোচনা প্রথম করা কর্ত্তব্য। কেননা যদি ঋষিদিগের কোন মাহাত্ম্য থাকে তবেই বেদের মাহাত্ম্য আছে। ঋষিদিগকে আধ্যাত্মিক রহস্যবিদ্ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকিলে বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিব; তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ জ্ঞান থাকিলে সেরূপ অর্থ না বুঝাই সম্ভব।

মনে কর আজকালকার একজন ভক্ত শাক্ত যিনি বিজ্ঞানের কোন ধার ধারেন না, তিনি একটি কথা বলিলেন যে,—যে শক্তি জন্য বৃক্ষস্থ ফল ভূতলে পতিত হয় সেই শক্তি বশতই গ্রহাদি জ্যোতিষ্ক সকল আকাশপথে ঘুরিতেছে; ভক্ত শাক্তের এই কথাতে তিনি যে তাঁহার ইষ্টদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন ইহাই বুঝিব. শক্তি অর্থে এখানে তাঁহার ইষ্টদেবতা এই অর্থই মনে আসিবে। কিন্তু ঐ কথাগুলিই আবার যদি নিউটনের কথা বলিয়া অর্থ করিতে যাই তবে ঐ বাক্যটি যে এক গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা এইরূপ অর্থই বুঝিব; নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation) সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্য ঐ কয়টি কথায় লিখিত রাখিয়াছেন ইহাই বুঝিব। সেইরূপ বেদবাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে গেলে ঋষিরা কিরূপ চিত্তের লোক ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ঋষি-চিত্তের অবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা আমরা এক্ষণে অনুভব করিতেও সক্ষম নহি, ঋষিগণ যোগাবস্থায়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতেন সেই সকল সত্য বিষয়ক তথ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতেও অসমর্থ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন আর প্রাচীন ঋষিগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে জগৎতত্ত্ব এবং পুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, দীপের আলোকের সহিত সূর্য্যের আলোকের যত প্রভেদ ইহাদের ভিতরও সেইরূপ প্রভেদ।

চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে এবং উহাদের একাগ্রতা যত বেশী হইবে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইতে থাকে। একথা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতগণ চিত্তের যে অবস্থার উপর দাঁড়াইয়া

সত্য অনুসন্ধান করিতেছেন পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রমতে উহা চিত্তের নির্ম্মল অবস্থা নহে। সম্পূর্ণ সমলচিত্ত ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল করিবার জন্য যত্ন ও অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত প্রথমেই যে অবস্থায় উপনীত হয় সেই সবিতর্ক যোগাবস্থা * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিত্তের অবস্থা। এই সবিতর্ক অবস্থা অপেক্ষা ঋষিচিত্তের পূর্ণ নির্ম্মলাবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সম্যক আলোচনা করুন। বেদ যে মহাত্মা ঋষিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম অবস্থার ফল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে যাহারা অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি পদার্থের আরাধনা করিত তাহারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; আমরা যাহাকে অগ্নি বা যাহাকে বায়ু বা যাহাকে সূর্য্য বলি সেই অগ্নি, সেই বায়ু, এবং সেই সূর্য্য যে বেদের দেবতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আমরা আজকাল দেখিতে পাই যে, অসভ্যেরা অগ্নি আদির ভয়ে ভীত, তাহারাই অগ্নি আদির উপাসক; কিন্তু যাহারা সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহারা আর কেহই অগ্নি বা বায়ু বা কোন জড়ের উপাসক নহেন; প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ যে অগ্নির উপাসনা করিতেন অগ্নিভীতিই তাহার কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা অন্য কোন কারণ ত দেখা যায় না—ইত্যাদি।

কিন্তু অগ্নি সূর্য্যাদি সম্বন্ধীয় মন্ত্র সকলের প্রকৃত অর্থ যোগশাস্ত্রের সাহায্য বিনা কখনই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। এবং যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেই বৈদিক ঋষিগণের অগ্নি উপাসনা বা সূর্য্যোপাসনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক ঋষিগণ ভয়ে বা উল্লাসে অগ্নি আদির স্তব করিতেন না তাঁহারা কেন যে অগ্নি বায়ুর উপাসনা করিতেন, পাতঞ্জল শাস্ত্র হইতে তাহার কারণ পাওয়া যায়।

---

* শব্দার্থ জ্ঞান বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা॥ সমাধিপাদ ৪২ সূত্র। বাক্যের সাহায্য ভিন্ন চিন্তা করা যায় কি না এই সম্বন্ধে ইউরোপে এখনও মতভেদ আছে। কিন্তু যোগীরা ইহা বুঝিতেন যে নির্বিতর্ক অবস্থাগ্রস্ত চিত্ত বাক্যের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করিতে সক্ষম। এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা।

পাতঞ্জলি বলেন যে সত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চিত্ত নির্ম্মল করা প্রয়োজন।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মনের্গ্রহিতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু
তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তি। সমাধিপাদ ৪১।

চিত্তের পূর্ব্ব সংস্কার সকল ক্ষীণ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে, নির্ম্মল মণিতে কোন দ্রব্য যেমন যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই নির্ম্মল চিত্তের গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। গ্রহিতা তৎস্থ গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে তন্ময়ত্ব এবং গ্রাহ্যে সমাপত্তি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর যে বিষয় অবলম্বনে চিন্তা করুক না তাহাতেই তাহার একাগ্রতা জন্মে, ইন্দ্রিয় সকল তন্ময় হয় এবং সেই বিষয় সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য যথাবৎ প্রতীয়মান হয়।

মনে কর সূর্য্য সম্বন্ধীয় সত্য একজন অনুসন্ধান করিতে চান, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত সাধারণ লোকের চিত্তের ন্যায় সমল, সূর্য্য সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য বিষয়ক প্রত্যয় তাঁহার চিত্তে যথাবৎ প্রতিফলিত হইবে না, কিন্তু যোগীর নির্ম্মল চিত্তে সেই সত্য বিষয়ক প্রত্যয় যথাবৎ জন্মিয়া থাকে। বেদে বাহ্যজগতীয় পদার্থ সকল যোগীর নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেরূপ প্রত্যয় জন্মায়, তাহারই বাচকমাত্র।

এই মন্ত্র সকলই বেদের দেবতা; বৈদিক দেবতার আরাধনা আর বেদ মন্ত্রের আরাধনা এই দুইটিই এক কথা। চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য যোগ শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে এই দেখা যায় যে সাধকের পক্ষে প্রথমতঃ বাহ্য স্থূল পদার্থে চিত্ত সংযম করিতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বনে চিত্ত সংযম করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বেদের অগ্নির আরাধনা অর্থ অগ্নি সম্বন্ধে চিত্ত সংযম করা, সূর্য্য আরাধনার অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করা। যাঁহারা চিত্ত সংযম করিতে শিখেন নাই তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না। চিত্ত সংযম কথাটির অর্থ পরিষ্কার করা চাই।

দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা॥ যোগশাস্ত্র বিভূতিপাদ ১
তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥২
তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩
ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪

কোন বিশেষ অবলম্বনে চিত্ত বদ্ধ হইলে চিত্তের সেই অবস্থার নাম ধারণা।১

অর্থাৎ চিন্তাকালে যে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছি সেই বিষয়ক প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন ভাব চিত্তে যখন আসিতে পায় না চিত্তের সেই অবস্থার নাম ধারণা।

তাহার পর ধারণা কালীন প্রত্যয় সকলের একতানতা বুঝিবার ক্ষমতা যখন জন্মে সেই অবস্থার নাম ধ্যান।২

এই ধ্যান এবং ধারণার সময় বাক্য আদির সাহায্যে, দ্রব্যের রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল আশ্রয় করিয়া চিন্তাস্রোত চলিতে থাকে কিন্তু সমাধি অবস্থায় চিত্তের অবস্থা ভিন্নরূপ।

ধ্যেয় বিষয় স্বরূপ শূন্যাবস্থায় যখন কেবল অর্থমাত্র রূপে চিত্তে প্রকাশ পায় চিত্তের সেই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা।৪

স্বরূপশূন্যাবস্থা এবং অর্থমাত্ররূপ এই কথা দুইটির অর্থ একটু পরিষ্কার করা চাই। ভৌতিক পদার্থ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া যে রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই তাহাদের স্বরূপ কিন্তু পদার্থের অর্থমাত্ররূপ আমাদের চিত্তের বিষয়, ইন্দ্রিয় সকলের নহে। ইংরাজীতে যাহাকে concrete idea বলিতে পারা যায় তাহাই দ্রব্যের স্বরূপ এবং যাহাকে abstract idea বলিতে পারা যায় তাহাই দ্রব্যের অর্থমাত্ররূপ। চিত্ত যেরূপ উন্নতাবস্থা পাইলে ধ্যেয় বিষয় সম্বন্ধীয় abstract idea লইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাই সমাধি অবস্থা।

যে অবস্থায় ধারণা ধ্যান এবং সমাধির একত্র যোগ হয় তাহার নাম সংযম অবস্থা। সমাধি অবস্থায় দ্রব্যের অর্থ মাত্ররূপ বিষয়ক যে প্রত্যয় জন্মে তাহার সহিত ধ্যানাবস্থা এবং ধারণাবস্থার জ্ঞানের একতানতা এই সংযম অবস্থায় জন্মে।

ঋষিরা সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি পদার্থে চিত্তসংযম করিয়া উক্ত পদার্থ সকলের অর্থমাত্ররূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া তজ্জনিত চিত্তের প্রত্যয় সকল আলোচনা করিয়া যে সকল বাক্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বেদবাক্য। আমরা যাহাকে অগ্নি বলি, বেদের অগ্নিদেবতার লক্ষ্য তাহাই বটে কিন্তু

প্রভেদ এই যে ঋষিদের সূর্য্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান একরূপ নহে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া সূর্য্য বিষযে আমাদের প্রত্যয় যেরূপ ঋষিদের কাছে তাহা সত্যমূলক নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষজনিত প্রত্যয় ঋষিদের কাছে চিত্তের মলাস্বরূপ; যোগী এই সকল মলা পরিষ্কার করিয়া তবে যোগাবস্থায় উপনীত হন, এবং তখন ইন্দ্রিযের সাহায্য ব্যতীত কেবল অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ বিষয়ক সত্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

বৈদিক ঋষিরা ধীশক্তিলাভের জন্য সূর্য্যারাধনা করিতেন; যোগশাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন তাঁহাদের জড়ারাধনার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাতঞ্জলি বলেন যে সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করিলে ভুবন জ্ঞান জন্মায়।

ভুবন জ্ঞানম্ সূর্য্য সংযমাৎ।

এই কথাটি যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রের "ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; অন্যে উহাতে একটু কবিত্ব বই আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্মিন্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমীর কাছে তাহা দিবা; এবং সর্ব্বভূতে যাহাকে জাগ্রতাবস্থা বলে মুনিগণ তাহাকে রাত্রি স্বরূপ দেখেন।

সাধারণ লোকে যে জ্ঞান লইয়া জাগ্রত থাকেন সংযমীর কাছে তাহা ভ্রমজ্ঞান, সাধারণের কাছে যে সত্যজ্ঞান প্রকাশ পায় না সংযমীর নিকট সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর্য্যঋষিগণ যে জ্ঞান অবলম্বনে জাগরিত থাকিতেন পশ্চাত্যগণ সেইখানে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পান না সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংযমী ঋষিগণকে যে চিনিতে পারেন নাই ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। চিত্তের সংযমাবস্থা কাহাকে বলে ইহা যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধারণা করিতে পারিবেন তখনই তাঁহারা ঋষি বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

চিত্ত সংযম অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য কতদূর উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন

জ্ঞান কতদূর সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হয়, পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা যিনি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন ঋষি নামে আর তাঁহার অশ্রদ্ধা কখনই সম্ভবিবে না। ভারতে ঋষিগণই সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বরূপ মান্য পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ঋষি মহাত্মা আজকালকার লোকে ভুলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই ঋষিদিগের আসনে আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে বসাইলে ভারতের অবনতি ব্যতীত উন্নতিব সম্ভাবনা দেখি না।

বেদমন্ত্র এবং মন্ত্রগত দেবতা সম্বন্ধে চিত্ত সংযম দ্বারা বেদের অর্থ বুঝিতে হয়। বেদের অগ্নি দেবতা বলিলে অগ্নি কথাটিতে যে অর্থ মাত্র রূপ (abstract idea) নিহিত আছে তাহাই অন্তরে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অগ্নি বিষয়ে চিত্ত সমাহিত লইলে অগ্নি যেমন স্বরূপ শূন্যাবস্থায় অর্থ মাত্ররূপ চিত্তে প্রকাশিত হইবে তখন অগ্নি সাক্ষাৎকার হইয়াছে জানিও, ইহার পূর্ব্ব বেদের অগ্নি কথায় কি ভাব নিহিত আছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সমাহিত অবস্থায় চিত্তপটে অগ্নির অর্থ যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হইলে পর চিত্তের ব্যুমান শক্তির সাহায্যে উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবে। অর্থাৎ সেই abstract ideaর সহিত কোন কোন concrete ideaর একতানতা আছে তাহাই বিচার করিবে, পরে সেই জ্ঞান বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে, কিরূপ ছন্দে অগ্নির পরিণাম ক্রম-চক্র শৃংখলাবদ্ধ এই সকল আলোচনা করিতে শিখিলে তবে বেদ মন্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা দ্বারা বেদের মন্ত্রার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে বেদের অগ্নি দেবতায় যে concrete idea বুঝায় তাহার লক্ষ্য যে কেবল মাত্র কাঠের আগুণ, তাহা নহে। জঠরাগ্নি কামাগ্নি জ্ঞানাগ্নি ইহারাও বেদের অগ্নি কথাটির লক্ষ্য।

কর্ম্ম করিতে গেলেই অগ্নির সহায়তা প্রয়োজন বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। কর্ম্ম কথাটতে শারীরিক মানসিক ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝায়। এই কর্ম্ম কথাটির অর্থের সহিত অগ্নি কথাটির অর্থের একতানতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আমাদের শারীরিক তাপাগ্নি, মনের কামাগ্নি ইহারাও অগ্নি কথার লক্ষ্য। যে শক্তির সাহায্যে

কর্ম্ম করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "Heat is transformed into work" কিন্তু তাঁহারা এই Work কথাটিতে স্থূল পদার্থের গতি ভিন্ন অন্য অর্থযোজন করেন নাই ; কিন্তু বেদে যখন অগ্নিকে কর্ম্মের মূল বলিয়া বুঝিতেন তখন কর্ম্ম কথাটিতে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝিতেন। যে শক্তি কর্ম্মে পরিণত করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। যে অগ্নি শক্তি সকলের গাড়ী চালায় তাহাও অগ্নি, যে শক্তি শারীরিক কর্ম্মে পরিণত হয় তাহা ও অগ্নি এবং যে শক্তি মানসিক চিন্তা আদি কর্ম্মে পরিণত হয় তাহাও অগ্নি। ইহাই বেদের অগ্নির অর্থমাত্রভাব (abstract idea)

বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি মন্ত্র আছে তাহার এক একটি মন্ত্র, অগ্নি সম্বন্ধীয় এক একটি concrete ideaর অভিব্যঞ্জক ; কিরূপ অগ্নি কোন মন্ত্রের লক্ষ্য তাহা যিনি বুঝিতে চান তিনি সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ কর্ম্মে সেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থকে সেই সমস্ত কথা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে শিখিবার কিছুই পান নাই কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বুঝিতে না পারিলে মন্ত্র ভাগও বুঝিতে কেহ সক্ষম হইবেন না।

বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার মহত্বের পরিচয়। বেদ মন্ত্র সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যেরূপ সাজান হইয়াছে, যেরূপ অধ্যায়, খণ্ড, প্রপাঠক এবং দশতি, ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহারও একটা কারণ আছে। কোন গ্রন্থ ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে সেই গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে যে সকল কথা বলা আছে সেই সকলের মধ্যে কিরূপ ক্রমানুযায়ী সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বেদমন্ত্র সকলে একটির পর অন্যটি যেরূপ সাজান হইয়াছে সেইরূপ সাজানর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যোগ অবলম্বন ভিন্ন পাশ্চাত্যগণ যে, অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; সে জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে ঋষিরা যেরূপ চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিতেন সেই প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন বেদের প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। মনে কর, আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতবেত্তা পণ্ডিতগণ যখন এই কথা বলেন যে দুইটি বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল চারিটি বিন্দু,* তখন তাঁহাদের একেবারে পাগল না বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে প্রথমে তাঁহাদের কথার অর্থটি বুঝিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক দুইটী বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল কখনই দুইটি বিন্দু অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, অথচ কনিক সেক্‌সনের (Conic Section) চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে "দুইটি বৃত্ত চারিটি বিন্দুতে কাটিয়া থাকে" এ কথার যে একটা অর্থ আছে, ইহা বুঝিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই সমস্ত কারণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে যিনি বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ইচ্ছুক তিনি প্রথমে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখুন; পাতঞ্জলি যাহাকে চিত্তসংযম বলিয়াছেন সেই চিত্তসংযম করিতে শিখুন, তবেই তিনি ঋষিবাক্য সমূহের প্রকৃত অর্থের আভাস পাইবেন।

হিন্দু।

একটি ঘরের কথা।

মুকুন্দ ঘোষ খুব বড় ঘরের ছেলে। বহুপূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা খুব মান্য গন্য ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী ছিল। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত পুরুষ

---

* Two circles cut each other at four points, two of which are imaginary (Analytical Conic Section.)

বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তালুক মুলুক যাহা ছিল সব গিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌বাগিচা নাখেরাজ জোত জমাও বিক্রয় হইয়াছে। ভদ্রাসন টুকুও কয়েক বৎসর নাই। মুকুন্দরা একখানি ছোট খড়ো ঘরে থাকে। সে ঘরের চালেও আবার খড় নাই। চালখানা স্থানে স্থানে শুকনা পাতা ঢাকা। মুকুন্দর মা ভাই বোন প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি পরিবার। তাহাদের দুবেলা অন্ন জুটে না। প্রায়ই ভিক্ষার উপর নির্ভর। কাহারো পরিধানের রীতিমত বস্ত্র নাই. সকলেই ছেঁড়া নেকড়া কোন রকমে গুছাইয়া পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে। ১০।১২ বৎসরের ভাই দুটো ত ন্যাংটোই বেড়াইয়া বেড়ায়। মাসে দুই চারি আনা পয়সা হইলে তাহারা গ্রামস্থ পাঠশালায় দুই অক্ষর শিখিতে পারে, তাহাও জুটে না, দিবারাত্রি হো হো করিয়াই বেড়ায়। মুকুন্দর এক বৎসরের একটি ছোট ভাই দুধ খেতে পায় না যৎসামান্য স্তনাপান করিয়া পেটের জ্বালায় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটায়। এইত গেল মুকুন্দের ঘরের অবস্থা, কিন্তু মুকুন্দ কলিকাতায় উন্নতি-বিধায়িনী সভার সভ্য হইয়া কেবল বড় বড় বক্তৃতা করে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালি মেম্বর হওয়াও কি ঠিক্ সেইরূপ নয়? বাঙ্গালি জাতি অতি অধম, অতি দরিদ্র, অতি অসার। বঙ্গালির ঘরে অন্ন নাই। যা এক আধ মুঠা অন্ন আছে তাহা কেবল পরে অনুগ্রহ করিয়া লয় না বলিয়া আছে, নতুবা তাহাও থাকিবার কথা নয়। বাঙ্গালির পরিধানের বস্ত্র নাই। যতক্ষণ না পরে একখানি বস্ত্র আনিয়া দিবে ততক্ষণ লজ্জা রক্ষা হওয়া ভার। একদিন বাঙ্গালি সমস্ত জগতকে কাপড় পরাইয়াছে। আজ বাঙ্গালি এতটুকু সূতার জন্যও পরের মুখাপেক্ষী। বাঙ্গালির বিদ্যা নাই, বাঙ্গালি মূর্খ। বাঙ্গালির সাহিত্য সবে সুরু হইয়াছে। সে সাহিত্যের শক্তি নাই, বিস্তার নাই, প্রকৃত সারবত্তা নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, তেজ নাই, প্রতাপ নাই, মহিমা নাই। বাঙ্গালির দেহ দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। বাঙ্গালির শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয় বাঙ্গালির তাহা নাই; যাহা থাকিলে জাতি জাতি হয়, বাঙ্গালি জাতির তাহা নাই। তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়?

বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি মানুষ নয় ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিলে বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি জাতি জাতি নয় বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়? গরিবের ছেলে মুকুন্দের উন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্য হওয়াও যা বাঙ্গালির ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়াও কি তাই নয়? ঘরে এত কাজ থাকিতে, আপনাকে মানুষ করিবার এত বাকি থাকিতে, আপনাদিগকে জাতি করিয়া তুলিবার এত বাকি থাকিতে, ব্রিটীশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া কেন? মানুষকে মানুষ করিতে কত শক্তি, কত সামর্থ্য, কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত একাগ্রতা, কত স্থিরলক্ষ্য লাগে বল দেখি? এত শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও মানুষকে মানুষ করিতে কত পুরুষ লাগে বল দেখি? আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কি এতই বাহুল্য হইয়াছে যে আমাদের ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজের জন্য এত উদ্বৃত্ত থাকে? তবে কেন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বল দেখি? ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতেও কিছু শক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু যখন আমরা এখনও মানুষই হই নাই, জাতিই হই নাই, তখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ? আমরা মানুষ হই নাই, ইহা না বুঝিবার দরুনই আমরা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে চাই। আমাদের ঘরের অবস্থা কি শোচনীয়, আমাদের মানুষ হইতে কতই বাকি, ইহাও আমরা বুঝি নাই—ইহা কি বিষম কথা! বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে যাওয়াতেই ত এই বিষম কথাটা এত বিকট ভাবে মনে উদয় হইল।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ইংরাজ জাতির জাতিত্বের অভিব্যক্তি। যে সকল শক্তির গুণে ইংরাজ ইংরাজ, যে সকল শক্তি সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সহস্র রকমে ইংরাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আজিকার ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট সেই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি বা অধিষ্ঠানস্থল। সে শক্তি বাঙ্গালিতে নাই, বাঙ্গালি সে শক্তিতে গঠিত হয় নাই। তবে ব্রিটিশ

পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালির স্থান কোথায়? বাঙ্গালিতে যে প্রকার শক্তি এবং যে সামান্য একটু শক্তি আছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টস্থিত শক্তির সহিত মিশ্ খাইবেই বা কেমন করিয়া, পারিয়া উঠিবেই বা কেমন করিয়া? কোরিন্থিয় প্রণালীতে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাতে গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত যে স্তম্ভ তাহা কেমন করিয়া খাটিবে? ইংরাজের শক্তিতে ইংরাজের পার্লেমেণ্ট গঠিত। অতএব সে পার্লেমেণ্ট ইংরাজকেই বুঝে, ইংরাজের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাই মিটাইতে পারে। ভারতকে সে পার্লেমেণ্ট বুঝে না, বুঝিতে পারেনা এবং পারিবে ও না। সে পার্লেমেণ্ট কেমন করিয়া ভারতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে? সেই জন্যইত ব্রাইট ফসেটের ন্যায় সে পার্লেমেণ্টের মহা প্রতাপশালী ইংরাজ সভ্যেরাও ভারতের জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না? তবে ক্ষুদ্র বাঙ্গালি সে পার্লেমেণ্টে গিয়া ভারতের জন্য কি করিবে? বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ধাত্ বুঝেনা বলিয়া সে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা বাঙ্গালির অসারতার প্রমাণ মাত্র!

বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিয়া ভারতের কিছু কাজ করিতে পারুক আর নাই পারুক, ভারতের এবং সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি করিবে ও নাম উজ্জ্বল করিবে ইহা ও কি কথা? বাঙ্গালি বিজিত, ইংরাজ বিজেতা। বিজেতার পার্লেমেণ্টে বসিয়া বাঙ্গালি যদি এমন মনে করেন যে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল তবে ত তিনি তাঁহার বিজিত বা পরাধীন অবস্থাকেই শ্রেয় বা সম্মানসূচক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিজেতার গোলামি করিয়াই বা সম্মানিত মনে করিবেন না কেন? বিজেতা ভাল হইলে তাঁহার অধীনে থাকায় লাভও আছে এবং কিছু সুখও আছে এবং সেই জন্য বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিজেতা যতই ভাল হউন, বিজিত অবস্থাকে সম্মানের অবস্থা মনে করিলে বিজিতেরা কখনই মানুষ হইতে পারিবে না, জাতি ও হইতে পারিবে না।

আর একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি হইবে না, ইংরাজেরই মান বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালি যদি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে

পারে তবে জর্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাধীন এবং সুসভ্য জাতীয় লোকে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিবে না বরং ঘৃণা করিবে এরূপ সম্ভব। আর পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বিশেষ সম্মানের কথাই বা কিসে তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে গেলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না। সামান্য একটু বুদ্ধি এবং একটু বাক্‌শক্তি থাকিলেই পার্লেমেণ্টে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেরূপ একটু ক্ষমতা থাকিলে মানুষ যে বিশেষ সম্মানার্হ হয় তা নয়। তবে বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের কাছে কিসে যে সম্মানার্হ হইবে বুঝিতে পারি না। ফলতঃ বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বাড়িবে না, ইংরাজেরই মান বাড়িবে। বিজিতকে আপনার সর্ব্বোচ্চ অসীম-মহিমা-মণ্ডিত স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন শাসন সমিতিতে বসিতে দিলে প্রকৃত মানুষের কাছে ইংরাজেরই মান বাড়িবে, বাঙ্গালির মান বাড়িবে না। তবে সে সমিতিতে বসিবার জন্য বাঙ্গালি এত ব্যাকুল কেন? বাঙ্গালির দুর্বুদ্ধি কি ঘুচিবে না? বাঙ্গালির সুদিনের সূত্রপাত কি হইবে না?

শ্রীসঃ—

একটি পরের কথা।

পরের কথা কহিতে নাই। তবে পরকে লইয়া ঘর করিতে হইতেছে, তাই পরের কথা না কহিলেও চলে না। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ কেন যুদ্ধ করিলেন এ পর্য্যন্ত ভাল বুঝা গেল না। কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ বড় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ হইল, কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ্যের ধন রাশির জন্য যুদ্ধ হইল। কোন্‌টা ঠিক কথা তাহা এখন বলা যায় না এবং

বলা ও উচিত নয়। কোন্ কথাটা ঠিক যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা তাহা এক রকম স্থির করিয়া বলা যাইতে পাবে। কিন্তু তাহা আমরা বলিব না। ধনলোভ যদি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হয়, ইংবাজ তাহা মানিবেন না। মানিলে বিশেষ হানি কিছু নাই, বরং কিছু লাভ আছে। ধনলোভে পরের রাজ্য লইলাম, এ কথাটা বড় লজ্জাব কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই যদি ঠিক হয় তবে স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিলে ইংরাজের উপর বাস্তবিক তত অভক্তি হয় না। ববং সে কথাটা ছাপাইয়া, ব্রহ্মবাসীদিগেব উপকাব কি এমনি কোন একটা লম্বা চৌড়া কাবণ নির্দ্দেশ কবিলে ইংরাজের উপর বেশি অভক্তি হয়। কিন্তু ধনলোভ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হইলেও ইংরাজ তাহা মানিবেন না। ব্রহ্মরাজের অত্যাচাবই যুদ্ধেব কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। ষ্টেট্সমান সংবাদপত্রেব সুযোগ্য এবং সবলমতি সম্পাদক মহাশয় ও সেই কাবণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও সেই কাবণটিকে প্রকৃত কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া দুই একটি কথা বলিব।

ব্রহ্মরাজ থিব যে অত্যাচাবী ছিল তাহার প্রমাণ কই? তাহার অত্যাচার যদি প্রমাণীকৃত হয় তবে সে কি জন্য অত্যাচার করিয়াছিল তাহা ত বুঝিয়া দেখা চাই। অত্যাচাব করিয়া থাকিলেই যে থিব রাজচ্যুত হইবে এমন ত কথা নাই। যাহাদিগকে থিব মারিয়া ফেলিয়াছিল তাহারা যদি থিবর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, থিবকে এবং তাহার পরিবারকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তবে তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকিলেও থিব ব্রাহ্মরাজ্যের রাজনীতি অনুসারে অন্যায় কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে। এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে থিবকে রাজ্যচ্যুত করিবার বিশিষ্ট কারণও জন্মে নাই। এ রকম কথা ও ত লোকে বলিতে পারে। এ কথার উত্তর কি?

বিশিষ্ট কারণেই হউক অথবা বিনা কারণেই হউক থিব যদি লোক হত্যা করিয়া থাকে, ইংরাজের তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ কি? থিব আপনার রাজ্যে আপনার প্রজাকে মারিয়াছে, ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? কাহাকে একটা অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে পাঁচজনে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহা নিবারণার্থ পাঁচ কথা কয় বটে; কিন্তু সে

যদি তাহাদের কথা না শুনে তবে তাহারা নাচার, তাহাদের আর কথা কহিবার অধিকার থাকে না। বিশেষ সে ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র সমাজস্থ হয় তবে ত কাহারো কোন কথা চলে না। শ্যাম রামকে মারিতেছে। হরি শ্যামকে নিষেধ করিল। শ্যাম নিষেধ বাক্য শুনিল না। হরি শ্যামকে মারিবে না কি? শ্যামের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায় রামের হাতে। রাম কেন শ্যামকে মারিয়া হউক কি অন্য যে প্রকারে হউক নিরস্ত করুক না। থিব স্বাধীন রাজা ছিল। সে অত্যাচার করিয়া থাকিলে ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? সে অত্যাচার নিবারণের উপায় তাহার প্রজাদের হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা ত কিছু করে নাই—আপনারা ও কিছু করে নাই এবং ইংরাজকে কি অপর কাহাকেও কিছু করিতে বলে নাই। তবে ইংরাজ কথা কন ই বা কেন, আর থিবকে মারেন ই বা কেন? যদিও ইংরাজ দয়াধিক্য বশতঃ কথা কন, তাঁহার কথা থিব না শুনিলে, থিবকে তিনি কোন্ স্বত্বে রাজ্যচ্যুত করেন? ষ্টেট্স্‌ম্যান সম্পাদক মহাশয় একটা international police-এর কথা কহিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, কোন রাজা যদি তাঁহার প্রজার উপর বেশী অত্যাচার করেন অথবা প্রজাকে মারিয়া ফেলেন, তবে অন্য রাজার তাঁহার সেই অত্যাচার নিবারণ করিবার অধিকার আছে, এবং সেই জন্য অন্য রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে পারে। এ নিয়মটা কোথাও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রচলিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপে কেবল তুর্কের সম্বন্ধে চলে, আর কাহারো সম্বন্ধে চলে না। এসিয়াতে এ নিয়ম কখনই চলে নাই, এবং চলিতে পারে এসিয়ার এখনও সে রকম অবস্থা হয় নাই। ইংরাজ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, ইংরাজ এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে; ব্রহ্মদেশবাসী তেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নয়, ব্রহ্মদেশবাসী এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে না। অতএব international police-এর নিয়ম এসিয়াতে কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। যে নিয়ম international হইবে, তাহা সকল জাতির বুঝিয়া স্বীকার করা চাই, নহিলে সে নিয়ম কেমন করিয়া *international* হইবে? আর একটা কথা এই। মনে কর এসিয়াতে international police-এর নিয়মটা

যুক্তিযুক্তরূপেই হউক আর অযৌক্তিকরূপেই হউক খাটান গেল। তার পর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন বড় রাজার যদি একজন ছোট রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকে তবে একজন ছোট রাজারও একজন বড় রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজের অত্যাচার বা অন্যায় বৃহৎ ইংরাজ-রাজ নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজ যদি বৃহৎ ইংরাজ-রাজের অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিতে চাহেন তাহাতে বৃহৎ ইংরাজরাজ কি কোন কথা কহিবেন না? এই যে ইংরাজরাজ্যে প্রতি-বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক মরিয়া যাইতেছে, ইংরাজরাজ তাহা নিবারণের বিশেষ কিছু উপায় করিতেছেন না। ইহাও ত একরকম প্রজা মারা বটে! এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজে যে কত লোক মরিল; সেও ত ইংরাজরাজের দোষে এবং সেও ত এক রকম প্রজা মারা বটে। সে রকম মারা যে একেবারে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলার অপেক্ষা ভয়ানক মারা। কিন্তু ব্রহ্মরাজ কি অপর কোন ক্ষুদ্র রাজা যদি সেই জন্য ইংরাজকে কোন কথা বলিতেন বা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেন তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ কি বড় সন্তুষ্ট হইতেন, না তাহাকে ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া আপনার শাসন-প্রণালী সংশোধন করিতেন? কখনই নয়। তবে কেন এই লম্বাচৌড়া international police-এর দোহাই দিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধের পোষকতা কর? আরো এক কথা। বড় রাজা ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজা বড় রাজাকে দমন করিতে পারে না। তবে বড় রাজা এবং ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে কেমন করিয়া international police এর নিয়ম খাটিতে পারে? যে নিয়ম সকলের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, সে নিয়ম সকলের প্রতি কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। ফল কথা, international police-এর কোন অর্থ নাই। ও কথাটা না তোলাই ভাল।

শেষ বলিবে যে অত্যাচার বা অন্যায় দেখিলে যাহার তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। মানিলাম, তাহাই ঠিক। কিন্তু অত্যাচার, অন্যায় ও নৃশংসতা ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ভয়ানক

মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার অবিচার হইয়া থাকে, দয়ালু ইংরাজ ত সেখানে গিয়া অত্যাচার নিবারণ করিয়া সুশাসন স্থাপন করেন না। তাহা করিবার ত ইংরাজের ক্ষমতা আছে। তবে কি দয়া ধর্ম্মের কথাটাও মিথ্যা?

এই সকল কারণে বাঙ্গালি ব্রহ্মযুদ্ধের বিরোধী। বাঙ্গালিকে বুঝাইয়া দেও যে ব্রহ্মযুদ্ধটা ন্যায় যুদ্ধ হইয়াছে, সে অবশ্যই ভুল স্বীকার করিবে।

শ্রীসঃ——

NEW YEARS DAY.

DRAMATIS PERSONAE.

রাম বাবু
শ্যাম বাবু
রাম বাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর প্রবেশ।

(রাম বাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যাম বাবু। গুড্ মর্ণিং রাম বাবু—হা ডু ডু?

রাম বাবু। গুড্ মর্ণিং শ্যাম বাবু—হা ডু ডু?

[উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দ্দন]

শ্যাম বাবু। I wish you a happy new year, and many many returns of the same.

রাম বাবু। The same to you.

[শ্যাম বাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রাম বাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রাম বাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল ?

রাম বাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যাম বাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রাম বাবু। সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে ঝেঁক্‌রে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে ঝেঁক্‌রে দিলে ? তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে Shaking hands ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের পরিবার নই! তা, তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে; তা কি ধর্‌তে আছে ?

স্ত্রী। আহা তাইত! ছ'ড়ে গেছে যে? অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্‌সে! সকাল বেলা মর্‌তে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি কর্‌তে এয়েছেন! আবার নাকি ছুটোছুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

রাম। সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে সেও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু!" তুমিও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু!" তা, হাঁ ডু ডু ডু খেল্‌বার কি আর তোমাদের বয়স আছে ?

রাম। আঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye do? উচ্চারণ করিতে হয়, "হা ডু ডু!"

স্ত্রী। তার অর্থ কি ?

রাম। তার মানে, "তুমি কেমন আছ ?"

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তুমি কেমন আছ," তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে!

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।

স্ত্রী। পাল্‌টে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেনরে ছুঁচো?" সেও কি তোমাকে পালটে বল্‌বে, "লেখাপড়া করিসনে কেনরে ছুঁচো?" এইটা সভ্য রীতি?

রাম। তা নয় গো, তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়া পালটে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দুবেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচবার তোমার কাছে খবর নিতে হয় তুমি কেমন আছ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে!

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্‌তে পারি। বুঝিয়ে দাও না? আচ্ছা শ্যাম বাবু এলো আর কি কিচির মিচির ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল; যদি হাঁডু ডু ডু খেলার কথা বল্‌তে আসেনি, তবে কি কর্‌তে এয়েছিল?

রাম। আজ নুতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এয়েছিল।

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশুর শাশুড়ী ত ১ লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১ লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১ লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১ লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১ লা শ্রাবণ থেকে?

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বৎসর ব'লে এত গুলা মদের বোতল আনিয়েছ কেন?

রাম বাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম,

তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ কর্‌তে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ কর্‌ব, যে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্ব্বোধ!

স্ত্রী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে?

স্ত্রী। এত কপি সালগম গাজর বেদানা পেস্তা আঙ্গুর ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বল্‌বে।

রাম। কি কথা বলিবে?

স্ত্রী। বলবে এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে।

[ইতি প্রহার ভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]

সংসার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর ভারি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌর বর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এবং অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে একটী "হৌসে" কর্ম্ম লইয়াছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হৌসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত যাইবার সময় হৌসের পুরাতন ভৃত্যের পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সৌভাগ্য যখন একবার উদয় হয় তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চার বৎসর হৌসের অনেক লাভ হওয়ায় সাহেবগণ বড়ই তুষ্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকেই হৌসের বড় বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ দু পয়সা আয় হইল, এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন, এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। বৈঠকখানায় দেবী বাবু প্রত্যহ ৮ টার সময় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবীবাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাটীতে বড় সমারোহে পূজা হইত, এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল,

প্রত্যহ তাহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান ধর্ম্ম করিত। দুই একজন করিয়া দেবীবাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি কুটুম্বিনীগণ সেই বিস্তীর্ণ বাটীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্ব্বদা তথায় আসিত, সুতরাং বাহির বাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাকীর্ণ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুব সহিত আলাপ করিলেন, এবং দেবী বাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈটকখানায় লইয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা আছে, দুই তিনটী মোটা মোটা গিদ্দে, এবং একটী কুলুঙ্গিতে দুইটী শামাদান। ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবিতে পরিপূর্ণ। কোথাও হিন্দু দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে জর্ম্মনি দেশস্থ অতি অল্প মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে ছবির কোন রমণী চুল বাঁধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্দ্ধেক আবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেজীওর একখানি "মেগ্‌ডেলীন", টিসীয়নের "ভিনস্" ও লেণ্ডসিয়রের এক জোড়া হরিণ ও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকৃষ্ট যে ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নিলামে যাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং দেবী বাবু বা দেবী বাবুর সরকারের রুচি সম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিও গ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈটকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেম সর্ব্বদাই দেবী বাবুর সহিত আলাপ করিতে যাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করিয়াও বলিতেন। দেবী বাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন হেম বাবুর মত লোকের অবশ্যই একটী চাকুরি হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেম বাবুকে লইয়া যাইবেন, হেম বাবুর ন্যায় লোকের জন্য তিনি এই টুকু করিবেন না তবে কাহার জন্য করিবেন?—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া হেমচন্দ্র একটু আশ্বস্ত হইলেন; দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রধান গুণ এইটী

যে তাহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাস বাক্য দিতে ত্রুটী করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবী বাবু ক্রটী করিলেন না। তিনি দুই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী হেম বাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন। বিন্দু কায কর্ম্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু দেবী বাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না, সুতরাং এক দিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া সুধাকে ও দুইটী ছেলেকে লইয়া পাল্কী করিয়া দেবী বাবুর বাড়ী গেলেন। দেবী বাবু তখন আপিশে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তব্ধ; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন সে অন্দর মহল লোকাকীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ ঝাট দিতেছে কেহ ঘর নিকাইতেছে, কেহ কাপড় শুখাইতে দিতেছে, কেহ এখনও মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়া, মা ঠাকরুণের কথাই গায়ে সয় না,—কোনও আশ্রিতা আত্মীয়া কিছু বলিয়াছে তাহা সহিবে কেন—দশ গুণ শুনাইয়া দিতেছে, ভদ্র রমণী সে বাক্যলহরী রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইলেন। পাতকো তলায় ঝি বৌয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরীগণ তথায় অবর্ত্তমানা প্রিয় বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়ে দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "হেঁলা ও বাড়ীর ন বৌয়ের জাঁক দেখিছিস, সে দিন যগ্‌গিতে এসেছিল তা গয়নার জাঁকে আর ভুঁয়ে পা পড়ে না, হেঁ গা তা তার স্বামীর বড় চাকুরি হয়েছে হই-ইচে, তা এত জাঁক কিসের লা।" কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন "তা হোক বন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার শাশুড়ী কি হারামজাদা। মা গো মা, অমন বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসে বলে সে বুড়ী যেন দু চক্ষে দেখতে পারে না। ঢের ঢের দেখেছি, অমনটী আর দেখিনি।" অন্য সুন্দরী গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন "ও সব সোমান গো, সব সোমান, শাশুড়ী আবার কোন্ কালে মায়ের মত হয়, দু বেলা

বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যায়।" "ওলো চুপ কর লো চুপ কর, এখনি নাইতে আসবে, তোর কথা শুনতে পেলে গায়ের চামড়া রাখবে না। তবু বন আমাদের বাড়ী হাজার গুণে ভাল, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শাশুড়ী মাগীর কথা শুনেছিস, সে দিন বউকে কাঠের চালাব বাড়ী ঠেঙ্গিয়েছিল।" "তা সে শাশুড়ীও যেমন বৌও তেমন, সে নাকি শাশুড়ীর উপর রাগ করে হাতের নো খুলে ফেলেছিল, তাহাতেই ত শাশুড়ী মেরেছিল।" "তা রাগ করবে না, গায়ের জ্বালায় করে, স্বামীটাও হয়েছে নক্ষীছাড়া, তার মা ও তেমনি, তা বৌয়ের দোষ কি?" ইত্যাদি।

রান্নাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়াগণ বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ দু'টো কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ ছেলে কোলে করে কেবল একটু ঝিমোতে ছিলেন। বামীর মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন "হে লা ও পালকী করে কারা আজ এলো? ঐ যে হন্ হন্ করে শিড়ি দে উঠে গিন্নীর কাছে গেল।" শ্যামীর মা, "তা জানিস নি ওরা যে এক ঘর কা'য়েত কোন পাড়া গাঁ থেকে এসেছে, এই ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেখলি, তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিষে চাকরি করবে, ওর বন ছোটটা বিধবা হয়েছে। গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।" "না জানি কেমন তর কায়েত, গায়ে দুখানা গয়না নেই, নোকের বাড়ী আসবে তা পায়ে মল নেই, খালি গায়ে ভদ্র নোকের বাড়ী আসতে নজ্জা করে না?" "তা বোন, ওরা পাড়া গাঁথেকে এসেছে, আমাদের কলকেতার চালচোল এখনও শেখেনি।" "তা শিখবে কবে? দু ছেলের মা হয়েও শিখলে না ত শিখবে কবে?" "তা গরিবের ঘরে সকলেরই কি গয়না থাকে?" "তবে এমন গরিবকে ডাকা কেন? আমাদের গিন্নীর ও যেমন আক্কেল, তিনি যদি ভদ্র ইতর চিনবেন তবে আমাদেরই এমন কষ্ট কেন বল?" এই ছিলুম আমার মাসতুত বনের বাড়ী, তা সে আমার কত যত্ন করত, দুবেলা দুদ বরাদ্দ ছিল। তারা নোক চিনত। গিন্নী যদি লোক চিনবে তবে আমার এমন দুরবস্থা? তা গিন্নীরই দোষ কি বল? যেমন বাপ মায়ের মেয়ে তেমনি স্বভাব চরিত্র,—টাকা হলে জাত ত আর ঘোচে না।" এইরূপে বৃদ্ধা আপন

গৌরব নাশের আক্ষেপ ও আশ্রয়দাত্রী ও তাঁহার পিতা মাতার অনেক সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল দেওয়া বারাণ্ডা দিয়া গিন্নীর শোবার ঘরে গেলেন। গিন্নী তেল মাখছিলেন একজন আশ্রিতা আত্মীয়া তাঁহার চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করে তেল মালিস করিয়া দিতেছেন। তাঁহার বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড় মানুষ গিন্নীদের একটা কিছু থাকেই.) তা কবিরাজ বলিয়াছে রোজ স্নানের আগে এক ঘণ্টা করিয়া বেশ করে তেল মালিস করিতে। গিন্নী দেবী বাবুর ন্যায় বলিষ্ঠ নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ, চেহারা খানা একটু রুক্ষ, মেজাজটা একটু খিট্‌খিটে, সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়া, দাসী, বৌ, ঝি, সকলেই সে মেজাজের গুণ প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা অনুভব করিত, শুনিয়াছি দেবী বাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আস্বাদন পাইতেন দেবী বাবু স্বয়ং বিষয়.করিয়াছেন. তাঁহাব আচরণটী পূর্ব্ববৎ নম্র ছিল, কিন্তু নূতন বড় মানুষের মহিষীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধন দর্প দেবী বাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আধার পাইয়া দ্বিগুণ ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল?

গিন্নী। "কে গা তোমরা?"

বিন্দু। "আমরা তালপুখুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কলকেতা এসেছি। আপনি আসতে বলেছিলেন, কাযের গতিকে এত দিন আসতে পারিনি, তা আজ মনে করলুম দেখা করে আসি।"

গিন্নী। "হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বস বন। তখনকার কালে নূতন নোক এলেই পাড়ার লোকেদের সঙ্গে দেখা করা রীতি ছিল, তা এখন বাছা সে রীতি উঠে গিয়েছে, এখন নোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল তোমরা এসেছ, ভাল। তালপুখুর কোথায় গা? সেখানে ভদ্র নোকের বাস আছে?"

বিন্দু। "আছে বৈকি, সেখানে তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রনোক আছে, আর অনেক ইতর নোকের ঘর আছে। ঐ বর্দ্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটওয়া থেকে ৭। ৮ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুখুর গ্রাম।"

গিন্নী। "হাঁ২ কাটওয়া শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের ঝিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে।" অল্প হাস্য সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গৃহিণী বলিলেন "ঐটি বুঝি তোমার বন? আহা এই কচি বয়সে বিধবা হয়েছে! তা ভগবানের ইচ্ছা, সকলের কপালে কি সুখ থাকে তা নয়, সকলের টাকা হয় তা নয়, বিধাতা কাউকে বড় করেন কাউকে ছোট করেন।"

প্রথম সংখ্যক আশ্রিতা, যিনি চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন "তা নয় ত কি, এই ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের বাবুর যেমন টাকা কড়ি, ঘর সংসার তেমন কি সকলের কপালে ঘটে? তা নয়, ও যার যেমন কপালের লিখন।"

দ্বিতীয় সংখ্যক আশ্রিতা অনেকক্ষণ ক্রমাগত তেল মালিশ করিতে করিতে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারও একটী কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন "কেবল টাকা কড়ি কেন বল বন, যেমন মান, তেমনি যশ, তেমনি লেখা পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। লক্ষ্মী সরস্বতী যেন ঐ খাটের খুরোয় বাঁধা আছে।"

ঈষৎ হাস্যের আলোক গিন্নীর রুক্ষ বদনে লক্ষিত হইল, কথাটী তাঁহার মনের মত হয়েছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন "আহা তুমি কতক্ষণ মালিশ করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে। আর সব গেল কোথা, কাযের সময় যদি একজন লোক দেখতে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে তা কায করবে কেমন করে?"

তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল; দাসীতে২ এই কথা কানা কানি হইতে হইতে তারের খবরের ন্যায় পাতকোতলায় পহুঁছিল। সহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল, বৌয়ে বৌয়ে ঝিয়ে ঝিয়ে কানা কানি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে গিয়া পহুঁছিল। তথায় যে উনানে কাট দিতে ছিল সে স্তম্ভিত হইল, যে ঝিমাইতেছিল সে সহসা জাগরিত হইল, ও শ্যামীর মা ও বামীর মা গিন্নীর সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে করিতে সহসা হৃদ্‌কম্প বোধ করিল। তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া সভয়ে গিন্নীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বামীর মা। "হে গা আজ বুকটা কেমন আছে গা? আমি এই রান্নাঘরে উনুনে কাট দিচ্ছিলুম তাই আস্‌তে পারি নি, তা একবার দি না বুকটা মালিস করে।"

গিন্নী। "এই যে এসেছ, তবু ভাল। তোমাদের আর বার হয় না, নোকটা মরে গেল কি বেঁচে আছে একবার খোঁজ খবরও কি নিতে নেই। উঃ যে বেথা, একি আর কমে, পোড়ামুখো কবরেজ এই এক মাস ধরে দেখছে তা ও ত কিছু কত্তে পাল্লে না। তা কবরেজেরই বা দোষ কি, বাড়ীর নোক একটু সেবা টেবা করবে, একটু দেখে শুনে তবে ত ভাল হয়। তা কি কেউ করবে? বলে কার দায়ে কে ঠেকে?"

বামীর মা ও শ্যামীর মা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া মালিশ আরম্ভ করিল, গিন্নী পা দুটী ছড়াইয়া মুখে তেল মাখিতে মাখিতে আবার বিন্দুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। "তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে, অমন কাহিল কেন গা?"

বিন্দু। "ওরা হয়ে অবধি কাহিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, আর ছোটটীর আবার একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন সেরেছে।"

গৃহ। "তাইত হাড় গুণো যেন জির জির করছে! তা বাছা একটু জেয়দা করে দুদ খাওয়াতে পার না, তা হলে ছেলে দুটী একটু মোটা হয়। এই আমার ছেলেদের দিন এক সের করে দুদ বরাদ্দ, সকালে আধ সের বিকেলে আধ সের। তা না হলে কি ছেলে মানুষ হয়?"

বিন্দু। "দুদ খায়, গয়লানীর যে দুদ, আদ্দেক জল, তাতে আর কি হবে বল?"

গৃ। "ও মা ছি! তোমরা গয়ালনীর দুদ খাওয়াও, আমাদের বাড়ীতে গয়লানী পা দেবার যো নেই। আমাদের বাড়ীর গরু আছে, ঐ সে দিন ৮০ টাকা দিয়ে বাবু আপিষের কোন সাহেবের গরু কিনে এনেছেন, ৫ সের করে দুদ দেয়। তা ছাড়া দুটা দিশি গরু আছে, তাহারও ৩।৪ সের দুদ হয়। বাড়ীর গরুর দুদ না খেয়ে কি ছেলে মানুষ হয়, গয়লানীর আবার দুদ, সে পচা পুখুরের পানা বৈত নয়, সে নদ্দমার জল বৈত নয়।"

বিন্দু একটু ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন "তা সকলের ত সমান

অবস্থা নয়, ভগবান্ আপনার মত ঐশ্বর্য্য ক জনকে দিয়াছেন? আমরা গরু কোথা পাব বল? যা পাই তাইতে ছেলে মানুষ কত্তে হয়।"

একটু হৃষ্ট হইয়া গৃহিণী বলিলেন,

"তা ত বটেই। তা কি করবে বাছা, যেমন করে পার ছেলে দুটীকে মানুষ কর। তা যখন যা দরকার হবে আমার কাছে এস, আমার বাড়ীতে দুধের অভাব নেই, যখন চাইবে তখনই পাবে।"

বামীর মা। "তা বই কি, এ সংসারে কি কিছুর অভাব আছে? দুধ দৈয়ের ছড়াছড়ি আমরা খেয়ে উঠ্‌তে পরি নি, দাসী চাকরে খেয়ে উঠতে পারে না। তোমার যখন যা দরকার হবে বাছা গিন্নীর কাছে এসে বোলো, গিন্নীর দয়ার শরীর।"

শ্যামীর মা। "হাঁ তা ভগবানের ইচ্ছায় যেমন ঐশ্বর্য্য তেমনি দান ধর্ম্ম। গিন্নীর হিল্লতে পাড়ার পাঁচ জন খেয়ে বত্তাচ্ছে।"

গৃ। "তোমার স্বামীর একটী চাকরী টাকরী হল? বাবুর কাছে এসেছিল না।"

বিন্দু। "হেঁ এসেছিলেন তা এখনও কিছু হয় নাই, বাবু বলেছেন একটা কিছু করে দিবেন। তা আপনারা মনোযোগ করিলে চাকরী পেতে কতক্ষণ?"

গৃ। "হাঁ তা বাবুর সাহেব মহলে ভারি মান, তাঁর কথা কি সাহেবরা কাট্‌তে পারে? ঐ সে দিন বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ীর ছোঁড়াটাকে একটা সরকারী করে দিয়েছেন, বামুণের ছেলেটা হেঁটে হেঁটে মরতো, খেতে পেত না, তাই বল্লুম ছেলেটার কিছু একটা করে দাও। বাবু তখনই সাহেবদের বলে একটা চাকুরি করে দিলেন। আর ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর ছোগরাটা, সে এখানেই থাকে, বাজার টাজার করে; তার মা তিন মাস ধরে আমার দোরে হাঁটাহাঁটি করলে; তার বৌ একদিন আমার কাছে কেঁদে পড়ল, যে সংসারে চাল ডাল নেই, খেতে পায় না। তা কি করি, তারও একটা চাকরি করে দিলুম। তবে কি জান বাছা, এখন সব ঐ রকম হয়েছে, পয়সা ত কারও নাই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে, আমি আর ব্যারাম শরীর নিয়ে পেরে

উঠি নি। এ যেন কালিঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জালিয়ে তুলেছে। তা বলো তোমার স্বামীকে বাবুর কাছে আসতে, দেখা যাবে কি হয়।"

দেড় ঘণ্টার পর গৃহিণীর তৈলমার্জ্জন কার্য্য সমাপ্ত হইল, তিনি স্নানের জন্য উঠিলেন।

বিন্দু সর্ব্বদাই ধীর স্বভাব, সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে এখনও শিখেন নাই, এই প্রথম শিক্ষাটা তাঁহার একটু তিক্ত বোধ হইল। ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া ভগিনী ও সন্তান দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীন বাবু।

কলিকাতায় আসিবার পর কয়েক সপ্তাহ সুধা বড় আহ্লাদে ছিল। যাহা দেখিত সমস্তই নূতন, যেখানে যাইত নূতন২ দৃশ্য দেখিত, বাড়ীতে যে কায করিতে হইত তাহাও অনেকটা নূতন প্রণালীতে, সুতরাং সুধার সকলই বড় ভাল লাগিত। কিন্তু কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল পল্লীগ্রামের গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, বিন্দুদের ক্ষুদ্র বাটীতে বড় বাতাস আসিত না, কোঠা ঘরগুলি অতিশয় উত্তপ্ত হইত। সে কষ্টেতেও সুধা কষ্ট বোধ করিত না, কিন্তু তাহার শরীর একটু অবসন্ন ও ক্ষীণ হইল, প্রফুল্ল চক্ষু দুটী একটু ম্লান হইল, বালিকার সুগোল বাহু দুটী একটু দুর্ব্বল হইল। তথাপি বালিকা সমস্ত দিন গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত অথবা বাল্যোচিত চাপল্যের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, সুতরাং হেম ও বিন্দু সুধার শরীরের পরিবর্ত্তন বড় লক্ষ্য করিলেন না।

বর্ষার প্রারম্ভে, কলিকাতার [illegible] বায়ুতে সুধার জ্বর হইল। একদিন

শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইল, বৈকালে বালিকা কোনও কায কর্ম্ম করিতে পারিল না, শয়ন ঘরে একটী মাতুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু সে ঘরে আসিয়া দেখিল বালিকা তখনও শুইয়া রহিয়াছে। লিলেন,

"এ কি সুধা, এ অবেলায় শুইয়া কেন? অবেলায় ঘুমালে অসুক করবে, এস ছাতে যাই।"

সুধা। "না দিদি, আমি আজ ছাতে যাব না।"

বিন্দু। "কেন আজ অসুক কচ্চে নাকি? তোমার মুখ খানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে যে।"

সুধা। "দিদি আমার গা কেমন কচ্চে, আর একটু মাথা ধরেছে,।"

বিন্দু সুধার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা অতিশয় উত্তপ্ত, কপাল গরম হইয়াছে। বলিলেন "সুধা তোমার জ্বরের মত হইয়াছে যে। তা মেজেয় শুয়ে কেন, উঠে বিছানায় শোও, আমি বিছানা করে দিচ্চি।"

সুধা। "না দিদি এ অসুখ কিছু নয়, এখনই ভাল হয়ে যাবে, আমি এখানে বেশ আছি, আর উঠতে ইচ্ছে কচ্চে না।"

বিন্দু। "না ব'ন্ উঠে শোও, তোমার জ্বরের মতন করেছে, মাথা ধরেছে, মাটিতে কি শোয়?"

বিন্দু বিছানা করিয়া দিলেন, ভগিনীকে তুলে বিছানায় শোয়াইলেন, এবং আপনি পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে হেম ও শরৎ আসিলেন, অনেকক্ষণ উভয়ে বিছানার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তখন বিন্দু হেমের জন্য ভাত বাড়িতে গেলেন। শরৎকেও ভাত খাইতে বলিলেন, শরৎ বলিলেন বাড়িতে গিয়া খাইবেন।

ভাত বাড়া হইল, হেম ভাত খাইতে গেলেন, শরৎ একাকী সেই ক্লান্তা বালিকার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালিকার শরীর তখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়াছে, বালিকা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, কেবল জল চাহিতেছে, আর অতিশয় শিরোবেদনার জন্য এক একবার কাঁদিতেছে। শরৎ সযত্নে চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন,

মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু জল দিয়া আপন বস্ত্র দিয়া ওষ্ঠ দুটী মুছাইয়া দিলেন।

হেম শীঘ্র খাইয়া আসিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া শরৎকে বাটী যাইতে বলিলেন। শরৎ দেখিলেন সুধার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি সে দিন রাত্রি তথায় থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

বিন্দু ও খাইয়া আসিলেন, শরৎ বলিলেন,

"বিন্দু দিদি, আজ আমি এখানে থাকিব, তোমদের হাঁড়ীতে যদি চাট্‌টী ভাত থাকে আমার জন্য রাখিয়া দাও।"

বিন্দু। "ভাত আছে, আজ সুধার জন্য চাল দিয়ে ছিলুম, তা সুধা ত খেলে না, ভাত আছে। কিন্তু তুমি কেন রাত জাগ্‌বে, আমরা দুই জনে আছি সুধাকে দেখব এখন, তুমি বাড়ী যাও, রাত দুপুর হয়েছে।"

শরৎ। "না বিন্দু দিদি, তোমার ছোট ছেলেটির অসুখ করেছে তাকেও তোমাকে দেখতে হবে, আর হেম বাবু আজ অনেক হেঁটেছেন, রাত্রিতে একটু না ঘুমালে অসুখ করবে। তা আমরা দুই জনে থাকলে পালা করে জাগতে পারব।"

বিন্দু। "তবে তুমি ভাত খেয়ে এস, তোমার জন্য ভাত বেড়ে দি ?"

শরৎ। ভাত বেড়ে এই ঘরের এক কোনে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও, আমি একটু পরে খাব।"

বিন্দু। "সে কি ? ভাত কড়কড়ে হয়ে যাবে যে। অনেক রাত হয়েছে, কখন খাবে ?"

শরৎ। "খাব এখন বিন্দু দিদি, আমি ঠাণ্ডা ভাতই ভাল বাসি, তুমি ভাত রেখে দাও।"

বিন্দু রান্নাঘরে গেলেন, ভাত ব্যঞ্জনাদি থালা করিয়া সাজাইয়া আনিয়া সেই ঘরের এক কোনে রাখিয়া ঢাকা দিলেন। তাঁহার ছেলে দুটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের শোয়াইলেন। অন্য দিন সুধা বিন্দুর সঙ্গে ও শিশু দুটীর সঙ্গে এক খাটে শুইতেন, আজ তাহা হইল না। আজ হেম বাবুর নিকট শিশু দুটীকে শোয়াইয়া বিন্দু ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন,

বিন্দুর মাথার কাছে তখনও শরৎ বসিয়া নিঃশব্দে রোগীর সুশ্রুষা করিতেছিলেন।

শরৎ। "হেম বাবু আপনি এখন একটু ঘুমুন, আবার ও রাত্রিতে আমি আপনাকে উঠাইয়া দিয়া আমি একটু শুইব। সুধার গা অতিশয় তপ্ত হইয়াছে বড় ছট্ ফট্ করিতেছে, একজন বসিয়া থাকা ভাল। বিন্দু দিদি একা পারবেন না।"

হেমচন্দ্র শয়ন করিলেন। বিন্দু ও শরৎ রোগীর শয্যায় একবার বসিয়া একবার বালিসে একটু ঠেসান দিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রোগীর আজ নিদ্রা নাই, অতিশয় ছট্ফট্ করিতেছে, শিরোবেদনায় অধীর হইয়া দিদির গলায় হাত জড়াইয়া এক একবার কাঁদিতেছে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বার বার জল চাহিতেছে। শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে জল দিতে লাগিলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বিন্দু অতিশয় জেদ করাতে শরৎ উঠিয়া গিয়া ভাত খাইলেন! তখন সুধার রোগের একটু উপশম হইয়াছে, শরীরের উত্তাপ ঈষৎ কমিতেছে, যাতনার একটু লাঘব হওয়ায় বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিন্দু বলিলেন "শরৎ বাবু, তুমি এখন বাড়ী যাও, সুধা একটু ঘুমাইয়াছে, তুমি শোওগে, সমস্ত রাত্রি জাগিও না, অসুখ করিবে।"

শরৎ। "বিন্দু দিদি তোমার কি সমস্ত রাত্রি জাগা ভাল, তুমি সমস্ত দিন সংসারের কায করিয়াছ, আবার কাল সমস্ত দিন কায করিতে হবে। আমার কি, আমি না হয় কাল কলেজে নাই গেলুম।"

বিন্দু। "না শরৎ বাবু, আমাদের রাত্রি জাগা অভ্যাস আছে, ছেলের ব্যারাম হয়, কিছু হয়, সর্ব্বদাই আমরা রাত্রি জাগিতে পারি, আমাদের কিছু হয় না। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সমস্ত রাত জাগা সয় না, আমার কথা রাখ, বাড়ী যাও। আবার কাল সকালে না হয় এসে দেখে যেও।"

সুধা তখন নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রার নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসে বালিকার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। শরৎ একটু নিরুদ্বেগ হইলেন; বিন্দুর নিকট

বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন, নিঃশব্দে নৈশ পথ দিয়া আপন বাটীতে যাইয়া প্রাতে ৪ঘটিকার সময় শয্যায় শয়ন করিলেন।

ছয়টার সময় উঠিয়া শরৎ চন্দ্র তাঁহার পরিচিত নবীন চন্দ্র নামক একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ভবানীপুরেই তাঁহার বাটী, ভবানীপুর অঞ্চলে একটু পসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, মনোযোগী, বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য, কিন্তু ডাক্তারির পসার একদিনে হয় না, কেবল গুণেও হয় না, সুতরাং নবীন বাবুর এখনও কিছু পসার হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র নাথ ভবানীপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ উকিল, এবং চন্দ্র বাবুর সহায়তায় নবীন একটী ঔষধালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ অল্প, লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। এ জগতে সকলেই আপন আপন চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন যুবকের অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য, চারি দিকেই পথ অবরুদ্ধ, সকল পথই জনাকীর্ণ। তথাপি নবীন বাবু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, পরিশ্রম ও যত্ন ও গুণদ্বারা ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া ধীর চিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। দুই একটী বাড়ীতে তাঁহার বড় যশ হইয়াছিল, যাহাদিগের বাড়ীতে তাঁহাকে দুই চারিবার ডাকা হইয়াছিল তাহারা অন্য চিকিৎসক আনাইত না।

সাতটার সময় শরৎ নবীন বাবুকে লইয়া হেমবাবুর বাড়ী পঁহুছিলেন। নবীন বাবু অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া সুধাকে দেখিলেন। জ্বর তখন কমিয়াছে কিন্তু তাপযন্ত্রে তখনও ১০১দাগ দেখা গেল; নাড়ী তখনও ১২০। অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিলেন? রাত্রি অপেক্ষা অনেক জ্বর কমিয়াছে, আজ উপবাস করিলে জ্বর ছাড়িয়া যাবে বোধ হয়?"

নবীন। "বোধ হয় না। আমি রিমিটাণ্ট জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি। এখন একটু কমিয়াছে কিন্তু এখনও বেশ জ্বর আছে, দিনের বেলা আবার বাড়াই সম্ভব।"

হেম একটু ভীত হইলেন। সেই সময়ে ভবানীপুরে অনেক

রিমিটান্ট জ্বর হইতেছিল, অনেকের সেই জ্বরে মৃত্যু হইতেছিল। বলিলেন "তবে কি কয়েক দিন ভুগিবে?"

নবীন। "এখনও ঠিক বলিতে পারি না, আর একবার আসিয়া দেখিলে বলিব। বোধ হইতেছে রিমিটান্ট জ্বর, তাহা হইলে ভুগিতে হবে বৈকি। কিন্তু আপনারা কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

এই বলিয়া একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন "এই ঔষধটী দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন, বৈকাল পর্য্যন্ত খাওয়াইবেন, বৈকালে আমি আবার আসিব। আর রোগীর মাথা বড় গরম হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত দিন মাথায় বরফ দিবেন, তৃষ্ণা পাইলেই বরফ খাইতে দিবেন, কিম্বা দুই একখানি আকের কুচি দিবেন। আর এরারুট কিম্বা নেস্‌লের দুগ্ধ খুব খাওয়াইবেন, দিনে তিন চারি বার খাওয়াইবেন। এ পীড়ায় খাদ্যই ঔষধ।"

শরতের সহিত বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া নবীন বলিলেন "শরৎ তোমাকে একটী কায করিতে হইবে।"

শরৎ। "বলুন।"

নবীন। "হেম বাবুকে অবকাশ অনুসারে জানাইবেন এ চিকিৎসার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব না।"

শরৎ। "কেন?"

নবীন। "তোমার সহিত আমার অনেক দিন হইতে বন্ধুত্ব, তোমাদের গ্রামের লোকের নিকট আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। হেম বাবুর অধিক টাকা কড়ি নাই, তাঁহার নিকট আমি অর্থ লইব না।"

শরৎ। "হেমবাবু দরিদ্র বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানি,—আপনি বিনা বেতনে চিকিৎসা করা অপেক্ষা আপনি অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি সত্য সত্যই তুষ্ট হইবেন।"

নবীন। "না শরৎ, আমার কথাটী রাখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা করিও। এ ব্যারাম সহসা ভাল হইবে আমি প্রত্যাশা করি না, আমাকে অনেক দিন আসিতে হইবে, সর্ব্বদা আসিতে হইবে। আমি যদি বিনা অর্থে

আসিতে পারি তবে যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখনই নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিব।”

শরৎ। ‘নবীনবাবু আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিব। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, অর্থেরও আবশ্যক আছে, বিনা পারিতোষিকে সকল রোগীকে দেখিলে আপনার ব্যবসা চলিবে কিরূপে?”

নবীন। “না শরৎ, আমার সময়ের বড় মূল্য নাই, তুমি জান আমার এখনও অধিক পসার নাই, বাড়ীতেই বসিয়া থাকি। আর আমার পসার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হয় তাহা আমি জানি না, কিন্তু এই একটী রোগের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বন্ধুর জন্য একটী বন্ধুর কায কর, আমার এই কথাটী রাখিও।”

শরৎ সম্মত হইলেন, নবীন চলিয়া গেলেন। শরৎ তখন ঔষধ, পথ্য বরফ, আক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। সেদিন রোগীর শয্যার নিকট থাকিতে অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু হেম সে কথা শুনিলেন না, শরৎকে জোর করিয়া কলেজে পাঠাইলেন।

অপরাহ্ণে শরৎ নবীনবাবুর সহিত আবার আসিলেন। নবীনবাবু রোগীকে দেখিয়াই বুঝিলেন তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, এ স্পষ্ট রিমিটাণ্ট জ্বর। রোগীর চক্ষু দুটী আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে, রোগীর মাথায় সমস্ত দিন বরফ দেওয়াতেও উত্তাপ কমে নাই, সুধার স্বাভাবিক গৌর-বর্ণ মুখখানি জ্বরের আভায় রঞ্জিত, এবং সুধা সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিয়াছে, এপাশ ওপাশ করিয়াছে, কখনও শুইয়াছে, কখনও বায়না করিয়া দিদির গলা ধরিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু সভয়ে দেখিলেন নাড়ী প্রায় ১৫০, তাপযন্ত্র দিয়া দেখিলেন তাপ ১০৫ ডিগ্রি!

ঔষধ ঘন ঘন খাওয়াইতে বারণ করিলেন, আর একটী ঔষধ লিখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে সেটী দিনের মধ্যে তিন বার, এবং রাত্রিতে যখন আপনাআপনি ঘুম ভাঙ্গিবে তখন একবার খাওয়াইলেই হইবে। খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, শরৎকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন “এ রোগের খাদ্যই ঔষধ, সর্ব্বদা খাদ্য দিবে, যথেষ্ট খাওয়াইতে ত্রুটী হইলে রোগী বাঁচিবে না।”

কয়েক দিন পর্য্যন্ত সুধা সেই ভয়ঙ্কর জ্বরে যাতনা পাইতে লাগিল। শরৎ তখন হেমের কথা আর মানিলেন না, পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিবা রাত্রি হেমের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন, ঔষধ আনিয়া দিতেন, নিজ হস্তে সাবু বা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বিন্দু সংসার কার্য্যবশতঃ কখন কখন রোগশয্যা পরিত্যাগ করিলে শরৎ তথায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন, হেমচন্দ্র শ্রান্তি ও চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইলে শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই রোগীর সেবা করিতেন। জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিলে শরৎ আপনার শ্রান্তি ও নিদ্রা ও আহার ভুলিয়া গিয়া নানারূপ কথা কহিয়া, নানারূপ গল্প করিয়া, নানা প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়া সুধাকে শান্ত করিতেন, জ্বরের অসহ্য যাতনায়ও সুধা সেই কথা শুনিয়া একটু শান্তি লাভ করিত। কখনও বালিকার ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নিদ্রিত করিতেন, কখন তাহার অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল রক্তশূন্য গৌরবর্ণ বাহুলতা বা অঙ্গুলি গুলি হস্তে ধারণ করিয়া রোগীকে তুষ্ট করিতেন; মাথা উষ্ণ হইলে শরৎ সমস্ত দিন বরফ ধরিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অর্দ্ধস্ফুট শব্দগুলি শরতের কর্ণে অগ্রে প্রবেশ করিত, বালিকা শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে সেই শরতের হস্ত হইতে একবিন্দু জল বা দুইখানি আকের কুচি পাইত, নিদ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই শরতের হস্ত হইতে উত্তপ্ত পথ্য পাইত।

১০।১২ দিবসে সুধা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিত না, চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না, মুখখানি অতিশয় শীর্ণ, কিন্তু তখনও জ্বরের হ্রাস নাই। প্রাতঃকালে ১০২ দাগের বড় কম হয় না, প্রত্যহ বৈকালে ১০৫ দাগ পর্য্যন্ত উঠে। নবীন একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন "শরৎ, চতুর্দ্দশ দিবসে এ রোগের আরোগ্য হওয়া সম্ভব, যদি না হয় তবে সুধার জীবনের একটু সংশয় আছে। সুধা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আর অধিক দিন এ পীড়া সহ্য করিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না।"

ত্রয়োদশ দিবসে নবীন সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর রোগ লক্ষ্য করিলেন। বৈকালে জ্বর একটু কম হইল, কিন্তু সে অতি সামান্য উন্নতি, তাহা হইতে কিছু ভরসা করা যায় না। শরৎকে বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে তুমি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিও, কল্য ভোরের সময় তাপমান

যন্ত্রে শরীরের কত উত্তাপ লক্ষ্য করিও। যদি ৯৮ হয়, যদি ৯৯ হয়, যদি ১০০ দাগের কম হয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ গ্রেন কুইনাইন দিও, ৮টার মধ্যেই আমি আসিব। যদি কাল বা পরশ্ব এ জ্বরের উপশম না হয়, সুধার জীবনের সংশয় আছে।"

শরৎ এ কথা বিন্দুকে বলিলেন না, হেমকেও বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে খাইয়া আসিলেন এবং সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন;—সে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি সেই স্থান হইতে উঠিলেন না;—এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রায় চক্ষু মুদিত করিলেন না।

উষার প্রথম আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দিয়া অল্প অল্প দেখা গেল। তখন সে ঘর নিঃশব্দ। হেমচন্দ্র ঘুমাইয়াছেন, বিন্দু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ছেলে দুটীর পাশে শুইয়া পড়িয়াছেন,—ছেলে দুটী নিদ্রিত। সুধা প্রথম রাত্রিতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণ প্রায় প্রদীপের স্তিমিত আলোক রোগীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের উপর পরিয়াছে।

শরৎ ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে সেই অতি শীর্ণ বাহুটী আপন হস্তে ধারণ করিলেন,—নাড়ী এত চঞ্চল, তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। তখন তাপযন্ত্র লইলেন, ধীরে ধীরে তাপযন্ত্র বসাইলেন,—নিঃশব্দে ঘড়ির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় উদ্বেগে জোরে আঘাত করিতেছিল।

টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ির শব্দ হইতে লাগিল, এক মিনিট, দুই মিনিট, চারি মিনিট, পাঁচ মিনিট হইল; শরৎ তাপযন্ত্র তুলিয়া লইলেন। প্রদীপের নিকটে গেলেন, তাঁহার হৃদয় আরও বেগে আঘাত করিতেছে, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না। হস্ত দ্বারা ললাট হইতে গুচ্ছ২ কেশ সরাইলেন; ললাটের স্বেদ অপনয়ন করিলেন, নিদ্রাশূন্য চক্ষুদ্বয় একবার, দুইবার মুছিলেন, পুনরায় তাপ যন্ত্রেরদিকে দেখিলেন।

শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রদীপের আলোকে ঠিক বিশ্বাস হয় না,

বোধ হয় তাঁহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। ভরসায় ভর দিয়া গবাক্ষের নিকটে যাইলেন,—দিবালোকে তাপ যন্ত্র আবার দেখিলেন। জ্বর কল্য প্রাতঃকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাপ যন্ত্র ১০ ডিগ্রি দেখাইতেছে! ললাটে করাঘাত করিয়া শরৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

শব্দে বিন্দু উঠিলেন। ভগিনীর নিকট গিয়া দেখিলেন, সুধা নিদ্রা যাইতেছে; গবাক্ষের কাছে আসিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু ভূমিতে শুইয়া আছেন। বলিলেন "আহা শরৎ বাবু রাত্রি জেগে ক্লান্ত হইয়াছেন, মাটিতে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আহা আমাদের জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন।" শরৎ উত্তর করিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, কেন বিন্দুকে সে ব্যথা দিবেন?

আর এক সপ্তাহ জ্বর রহিল। তখন সুধা এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ ফিরিতে পারিত না, মাথা তুলিয়া জল খাইতে পারিত না, কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখন এক আধটী কথা কহিত, খেংরা কাঠির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি একটু একটু নাড়িত। সুধার মুখের দিকে চাওয়া যাইত না, অথবা নৈরাশ্যে জ্ঞান হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পুত্তলির ন্যায় বসিয়া শরৎ সেই মুখের দিকে সমস্ত রাত্রি চাহিয়া থাকিত। গরিবের ঘরের মেয়েটী শৈশবে অন্ন বস্ত্রের কষ্টেও মাতৃস্নেহে জীবনধারণ করিয়াছিল, অকালে বিধবা হইয়াও ভগিনীর স্নেহে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পটী কয়েক দিন পল্লিগ্রামে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অদ্য সে পুষ্প বুঝি আবার মুদিত হইয়া নম্রশির নত করিল। দরিদ্র বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাস বুঝি সাঙ্গ হইল।

বিংশ দিবস হইতে নবীনও দিবারাত্রি হেমের বাটীতে রহিলেন। শরৎকে গোপনে বলিলেন "শরৎ তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি এই জ্বর না ছাড়ে তবে ঐ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় শরীরকে জীবিত রাখা মনুষ্য-সাধ্য নহে। আর দুই তিন দিন আমি দেখিব, তাহার পর আমাকে বিদায় দাও। আবার যাহা সাধ্য করিলাম, জীবন দেওয়া না দেওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

দ্বাবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় জ্বর একটু হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু ভরসা করা যায় না। রাত্রিতে দুই জনই শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহি-

লেন,—সে দিন সমস্ত রাত্রি সুধা নিদ্রিতা। এ কি আরোগ্যের লক্ষণ, না দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন?

অতি প্রত্যুষে শরৎ আবার তাপযন্ত্র বসাইলেন। তাপ যন্ত্র উঠাইয়া গবাক্ষের নিকট যাইলেন। কি দেখিলেন জানি না, ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন!

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই যন্ত্র শরতের হস্ত হইতে লইলেন, বিপদ্‌কালে ধীরতাই চিকিৎসকের বীরত্ব। তাপযন্ত্র দেখিলেন,—আস্তে আস্তে শরৎকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

শরৎ হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে বালিকার পরমায়ু শেষ হইয়াছে?"

নবীন। "পরমেশ্বর বালিকাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এযাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।"

তাপযন্ত্র দেখিতে শরৎ ভুল করিয়াছিলেন. নবীন দেখাইলেন তাপযন্ত্রে ৯৮ ডিগ্রি লক্ষিত হইতেছে। সুধার শরীরে হাত দিয়া দেখাইলেন জ্বর নাই, জ্বর উপশম হওয়ায় ক্ষীণ বালিকা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে।

ললাট হইতে কেশ গুচ্ছ সরাইয়া প্রাতঃকালে শরৎ বাড়ী আসিলেন। এক সপ্তাহ তিনি প্রায় রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়ন দুটী কালিমা-বেষ্টিত, —কিন্তু তাঁহর হৃদয় আজি নিরুদ্বেগ।

সীতারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম কখন সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখন দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে ইনি একজন

রাণী হইবেন। রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল, যে ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল,

"মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন্—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল, যে প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ার মুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্ব? তা, দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল,

"কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন তুমি কি জান না, যে মুসলমান, মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?"

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা আছি কি জন্যে? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত করবে—কিন্তু যদি না পারিলে?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাহাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কান দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া, যে আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর।" যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।"

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখন কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও একাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল,

"চুপ কর! যদি তোমার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুইজনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?"

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা, বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?"

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন

প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সম্বাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সম্বাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান দিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?"—রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে!" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর একজন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত সব্যপাদম্।

* * * চক্রীকৃত চারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এদিকে বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোবাব খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন, যে "আমরা এ রাজ্য মায় কিল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল,

"কি, এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তা. সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার মুখের উপর পড়িয়াছিল! সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল! তা হ'লে মানুষ রাত্রি দিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনি পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবী-দুর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া, যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে, মূর্খ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সে কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল—"আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্র দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আর আবার মুরলা আসে না!" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গেরেফতার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, মহিষী-সমীপে সম্বাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে, রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম, মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গরাম, রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না. সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কান ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এইটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল, যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণা স্বরূপ আপনার চিত্ত রমারে দিয়া, চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে?"

গঙ্গা। কেন আসিব?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ্ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এদিগে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে, মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, কত টাকা চাও। চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন, তোরাব খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালামুখী মুরলা যা বলিল তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সম্বাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা, আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে সে বিষয়ে খবর না আনিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেম সম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত সে পথ বন্ধ! তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না, কেন না রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এখন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না কেন, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তা যে হইল না এমত নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কানে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন,

"তোমারা ভাই হামেশা রাতকো ভিতরমে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জানকাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান আছে না কি? আমিই ত তোর জান!

পাঁড়ে। তোম ছোড়্‌নে সে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন জান ছোড়্‌নে সে সব অঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস আমি তোকে ছোড়েঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহু আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোগা, বক্সা হিঁয়া কিয়া কাম, হামকো কুছু মালুম নেহি, মালুম হোনাভী কুছ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ।

তৌ ভী, যব পুষিদা হোকে আতা যাতা, তব হম লোগোঁকে কুছ মিল না চাহিয়ে। তোমকো কুছ মিলা হোগা—আধা হমকো দে দেও, হম নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎ পরামর্শ। রাণীর কাছে গহনা খানা, কাপড় খানা, মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল,

"আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রে গঙ্গারাম পুর প্রবেশার্থ আসিল পাঁড়জী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল, ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে গল্প করিলে, যা দোষ আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত, একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তিনি কি আজ আসিলেন না?"

মু। তিনি আসিয়া ছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কায কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে

আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

রমার গা দিয়া, ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া, শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া, অজ্ঞান হইল। এমন কথা রমার এক দিনও মনে আসে নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল, যে সে দিকটা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের, একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে, এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া আসে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া, ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা, রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর দাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। বালি।

গঙ্গা। সে আবার কি?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল!

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই? বাতিকের ব্যামো।

গঙ্গা। সে কি?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দরমহলে ঢুকিতে পাও?

গঙ্গা। কেন আমি কি?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য?

গঙ্গা। আমি তবে কোথ.কার যোগ্য?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয়, ত আমাকে লইয়া চল। আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিল, এ দিগে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি তখন মন বুঝে? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে—সে কথাটা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভা মধ্যে বস্ত্র হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য এখন আমাদের সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"তদনন্তর দুঃশাসন সভা মধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর! হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর।' সেই দুঃখিনী ভাবিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। * এ দিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ

---

* আসেন নাই।

করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্ম প্রভাবে নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলেরব আরম্ভ হইল।"

ইহার মধ্যে দুইটী পদ প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক—"গোপীজন বল্লভ!" এবং "ব্রজনাথ।" এই স্থানটিকে যদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা যায় এবং উহা যদি ব্যাসদেব বা অন্য কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা মৌলিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

এ রকম কাপড় বাড়াটা বড় অনৈসর্গিক ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অলীক এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার আমাদের অধিকার আছে। যাঁহারা বলিবেন, যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন তাহা স্বপ্রণীত নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারাই সম্পন্ন করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈসর্গিক উপায়ের দ্বারা করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টি গোচর হয় না। যাঁহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগান্তরে হইত, তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে জগৎ চিরকাল এক নিয়মেই চলিতেছে। যদি তাহার অন্যথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

এক্ষণে, মহাভারতের মৌলিক অংশ যদি কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে স্পষ্টই এই বস্ত্রবৃদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না কোন সমকালবর্ত্তী লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার করিতে সাহস পাইতেন না। তখনকার আর্য্যবংশীয়গণ এখনকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ হইতেন, তাহা হইলেই এ সাহস সম্ভব।

আর যদি মৌলিক মহাভারত সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত না হয়,

যদি তৎপ্রণেতা অনেক পরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিতে পারে, কেন না তাঁহাকে কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং কিম্বদন্তীর সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথা জড়াইয়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু মৌলিক মহাভারত যদি পরবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তাহা হইলে যে অংশ অনৈসর্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য।

আমরা মহাভারতে যেখানে যেখানে ব্রজলীলা প্রাসঙ্গিক এইরূপ কোন কথা পাই, সেই খানেই দেখি যে তাহা কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুভদ্রা হরণ, বা দ্রোপদীস্বয়ম্বরের ন্যায় প্রকৃত এবং নৈসর্গিক ঘটনার সঙ্গে এমন কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না; চক্রাস্ত্র দ্বারা শিশুপাল বধ, বা দ্রোপদীর বস্ত্র বৃদ্ধি প্রভৃতি অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা দেখি। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় পাঠক তাহা করিবেন।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে দুইবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এমন রাগ যে যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। *যে কবি লিখিয়াছেন, যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত।* তার পর এখনকার ছোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে *এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।"* তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কোথায় *গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন।* তাহাতে শাল্ববধের কথাটা

উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়: শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদা কাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র ও নহে কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। ভরসা করি কোন পাঠক এসকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিগে মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে. ছোট ঠাকুরাণীটী সঙ্গে। মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সসম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনাব সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কিনা তাহা আমাদের বিচারে কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

যদিও কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি এই মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় হইতে দুই একটা কথা চুনিয়া পাঠককে উপহার দিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হইবে না।

যথার্থ ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে। "যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন, এবং কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু বর্গকে বশীভূত করেন। যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন

ও সর্ব্ব ধর্ম্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।" তা হইলে পাঠকদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, যে এই লক্ষণচ্যুত কোনব্যক্তি বামনাই ফলাইলে, তাহার সঙ্গে শূদ্রবৎ ব্যবহার করিতে পারেন।

পরোপকারের নিয়ম—"অযাচিত হইয়া অন্যের প্রিয়কার্য্য করিবে।"

খ্রীষ্টানদিগের Doctrine of Repentance—"কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়।"

তিন কথায় ধর্ম্ম শাস্ত্র সংগ্রহ—"কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে।"

Doctrine of Utility—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহা সত্য।"

যথার্থ তপস্যা কি? "ইন্দ্রিয় সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোঽনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই।"

যথার্থ যোগবিধি কি? "ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি।"

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কিছু সম্বন্ধ নাই। বড় মনোহর কথা, কিন্তু সকল গুলি কথা উদ্ধৃত করা যায় না।

তাহার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরভিন্ন দেবতা নাই।

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে

পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। একজন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বর জ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্য বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বর-জ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মেনু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষমূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন. সুতরাং যাঁহারা এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ. যে যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দু ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু বরুণাদি নাম গুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণ গুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদি পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যে হেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি; তুমি গগন মণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব।" এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদি পর্ব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

'হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতিপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন: তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ

উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার, তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ—"ওঁ সূর্য্য; অর্য্যমা ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ম্ভু ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীর বৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর, তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপ:—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ণ ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্র বাহু; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই স্থরাস্থরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শক্রগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরু-শক্তিধারী।"

তার পর আদি পর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎ-পতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্রস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমান-কান্তি, গগণবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে, যে তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং। গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

পরকাল।

পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক—সকলেই এ বিষয়ে একটা না একটা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা শাকওয়ালী মাছওয়ালী যাহাকেই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সে অভ্রান্ত ভাবে উত্তর দিবে যে মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হইয়া যমের বাটী যাইতে হয়, তথায় বিচার হইয়া গেলে দণ্ড লইতে হয়—অথবা স্বর্গে যাইতে হয়। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। দার্শনিক মত স্বতন্ত্র। তাহা সত্য কি মিথ্যা দার্শনিকেরাই জানিতেন। পরলোকের কথা যিনি যাহাই বলুন, সমুদয় অনুভবমূলক। তবে যে আমরা এ বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি তাহা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বাল্য সংস্কার ছাড়িয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া পরকালসম্বন্ধে একটা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে চাহেন—তাঁহাদের বলি আমাদের কথা সম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করুন। প্রমাণ আমাদের নিকট লইতে হইবে না, তাঁহারা নিজের প্রমাণ নিজে অনুসন্ধান করুন—তার পর বুঝিবেন আমরা যাহা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ গঠিত হয়; তখন আমাদের মন বুদ্ধি এ সকল কিছুই হয় না, কেবল মাত্র দেহটী হয়। মাতৃগর্ভের কার্য্য দেহ গঠন, তাহা সমাধা হইলে, দেহ বহিষ্কৃত বা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পর দেহের মধ্যে মনুষ্যত্ব সঞ্চার হইতে থাকে। দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। তথায় সেই মনুষ্যত্ব যে দেহেবা যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব তাহা প্রাপ্ত হইয়া বহিষ্কৃত হয়—সেই দ্বিতীয় জন্মকে লোকে বলে মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিই দ্বিজ। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে —দ্বিতীয় জন্ম দেহ হইতে।

যাঁহারা বলেন মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—সকলই ফুরায়—তাঁহারা এ দ্বিজত্ব স্বীকার করিবেন না—তাঁহারা মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদের এ ভ্রান্তি। মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়া যাক—তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এই জন্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনেক ঘটনা তাঁহারা দৈবাৎ ঘটিয়াছে

বলিয়া নিশ্চিন্ত হন--কিন্তু ঘটনাগুলি বাছিয়া, বুঝিয়া দেখিতে পারিলে—তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে দেহমুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটিয়াছে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কেবল গঠিত হইতে থাকে মাত্র। আমরা বলিয়াছি মাতৃগর্ভে দেহ মাত্র হয়—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেহের ভিতর মনুষ্য গঠিত হইতে থাকে। তখন একটী দুইটী করিয়া ক্রমে বৃত্তি গুলির উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। প্রথমের অধিকাংশ বৃত্তি গুলি দেহরক্ষার্থ, দেহ গেলে সে গুলি আর থাকে না—যথা রাগাদি। কতকগুলি সদ্বৃত্তি দেহসম্বন্ধে নহে, সে গুলি মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়। সেই গুলি লইয়াই মানুষ মানুষ। তাহা না জন্মিলে মনুষ্য অসম্পূর্ণ হয়—নষ্ট হইয়া যায়—মৃত্যুর পর আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন মাতৃগর্ভে দেহ গঠন হইতে হইতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত গর্ভস্রাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়—এ সংসারে সে দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ, ভূমিষ্ঠ দেহে নানা বৃত্তির স্থানে যদি কেবল দৈহিক বৃত্তিই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সে বৃত্তিগুলি যায়, পরকালে আর সে মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য শিশু ও বালক প্রভৃতির পরকাল নাই। তাহাদের দৈহিক বৃত্তি-মাত্র হইয়াছিল—দেহের সঙ্গে সেগুলি গেল—বাকি কিছুই থাকিল না; সেইরূপ আবার যে সকল বৃদ্ধের কেবল কাম ক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিমাত্র জন্মিয়াছে আর কোন সদ্বৃত্তি বিকাশিত বা অঙ্কুরিত হয় নাই তাহাদেরও সেই দশা, তাহাদেরও পরকাল নাই।

সকল দেশে ধর্ম্মবেত্তারা সদ্বৃত্তির আলোচনার যে অনুরোধ করিয়া থাকেন, সদ্বৃত্তি থাকিলেই পরকাল ভাল হয় যে বলেন, তাহার হেতু এই। ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে একটা কথা মনে হয় যে সদ্বৃত্তিই আমাদের দীর্ঘায়ুর মূল। সদ্বৃত্তি না থাকিলে দেহ নাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহনাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেহনাশের পরও জীবিত থাকি।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন পরে, আবার শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুইজনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী, ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া চন্দন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরে এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিল—"কি মিষ্ট পাখির শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তরতর গদ্‌গদ্‌ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠশব্দের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন, স্বামির কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল,

"এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রি? তোমায় আজি কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর, তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছু নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামির শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এতদিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাজ—আমার অন্য কাজ নাই; না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই পতিপ্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও? তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া না যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য, তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা তিনি যদি ঠিক করিয়া রাখিয়া থাকেন, যে আমারই হাতে তাঁহার সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী, মনে মনে বড় খুসী হইল। কথাগুলি শিষ্যার নিকট প্রাপ্ত গুরুদক্ষিণার ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এখনও জয়ন্তীর কথা ফুরায় নাই। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল,

"তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণী তীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্য?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার

শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যাব আবার সুখ দুঃখ কি? যোগ্যাযোগ্য কি? (পরে, সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন ভৈরবী বা বৈষ্ণবীর শিষ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কিছুই চিত্তে যেন স্থান না পায়—সকল দিকেই তাহা হইলে ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে, চল, তোমার স্বামির হউক কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

তখন উভয়ে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া, বিরূপা তীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনী শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন, নগর রক্ষার কাজ, এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগররক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত—শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল,

"দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে—আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপ দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিকর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ কর্ম্মই, অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই।

"ধর্ম্মে হৌক অধর্ম্মে হৌক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নহিলে মরিতে হইবে।

তা, মরি তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে।

ধর্ম্মপথে, পাইবার উপায় নাই। কাজেই অধর্ম্ম পথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে, সে করুক, যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে স্থূলভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম

করিতেছি। তাহা নহে; ধর্ম্ম যে চেষ্টা করে, সেই করিতে পারে। অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—

"অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে—কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি যদি আজ বলিয়া পাঠাই, যে কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তার পর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেইখানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়? সীতারামের এলেকায় ত একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মেনাহাতী আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই সীতারামের এলাকার বাহিরে, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আশামী—যেখানে যাইব, সম্বাদ পাইলে আমাকে সেইখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবন ও পাইব, রমাও পাইব। ইহার উপায় আছে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দেআলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান একজন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। পতি গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; উপপতি বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্য মধ্যে শিপাহী হইল। গঙ্গারাম, তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া

পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন, যে টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনা বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আশামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

বন্দেআলি সেখকে এই সকল কথা বলিতে বলিয়া দিয়া, গঙ্গারাম বলিলেন, "লিখিত উত্তর লইয়া আইস।"

বন্দেআলি বলিল, "আমার কথায় ফৌজদার সাহেব বিশ্বাস করিয়া খত দিবেন কেন?"

গঙ্গারাম বলিল, পত্র লিখিতে আমার সাহস হয় না। আমার এই মোহর লইয়া যাও। আমার মোহর তোমার হাতে দেখিলে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

বন্দেআলি মোহর লইয়া ভূষণায় গেল। ফৌজদারিতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী সরকারে, কারকুন দপ্তরের বখশী চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দে আলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুনকে ধরিল, কারকুন পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

গঙ্গারাম যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্দেআলি অবিকল সেই রকম বলিল। লিখিত উত্তর চাহিল। তোরাব খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন, যে গঙ্গারাম ত হাতছাড়া হইয়াইছে—এখন তাহাকে মাফ করায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন,

"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণায় ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—যাহার সঙ্গে পাঠকের মন্দিরে পরিচয় হইয়াছিল,—সেও পার হইতেছিল। ফকির, বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিল ?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দে আলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বকশী, মুনশী, কারকুন, পেস্কার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার, তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন,

"দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মেনাহাতীর তাঁবে অনেক শিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে, তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে দক্ষিণে পার হইতে হয়—উত্তর

পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি রাষ্ট্র করিবেন যে, আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মেনাহাতী তাহা বিশ্বাস করিবে, কেন না কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না, বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মেনাহাতী দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায়. যে আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মেনাহাতী ফৌজ লইয়া বাহির হইযা কিছু দূব গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মেনাহাতীর সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?

গঙ্গা। নলদী পবগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাহশালার করিতে পারি। আর টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিষ করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন—তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর মাঝে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে তুমি রাণীকে নেকা করিতে পারিতে।

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে মুসলমান করিয়া নেকা করিতে পারে, তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল,

"মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, এখন আমি স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে, যদি তোমার পরকালের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি, আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় অবিশ্বাস করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছুই বলিলেন না।

তখন সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না, যে চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। চাঁদশাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সম্বাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।"

চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদশাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন

পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্যাপার কি?"

চাঁদশাহ। হিন্দুরাও ইসলামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম রায়।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। অঁ্যা? না, মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদশাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।

সংসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু।

পীড়া আরোগ্য হইলেও স্থধা কয়েকদিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া কয়েক দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না।

তাহার পর অল্প অল্প করিয়া ঘরে বারাণ্ডায় বেড়াইত, অথবা শরতের সাহায্যে ছাদে গিয়া একটু বসিত। পক্ষীর ন্যায় সেই লঘু ক্ষীণ শরীরটী শরৎ অনায়াসে আপনার দুই হস্তে উঠাইয়া ছাদে লইয়া যাইতেন, আবার ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন।

এক্ষণে শরৎ পুনরায় কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈকালে হেমের বাটীতে আসিতেন, সুধাকে অনেক কথা, অনেক গল্প বলিয়া প্রফুল্ল রাখিতেন, রাত্রি নয়টার সময় সুধা শয়ন করিলে বাটী আসিতেন। সুধাও প্রতিদিন শরৎকে প্রতীক্ষা করিত, শরতের আগমনের পদধ্বনি প্রথমে সুধার কর্ণে উঠিত, শরৎ সিঁড়ি হইতে উঠিতে না উঠিতে প্রথমেই সেই ক্ষীণ কিন্তু শান্ত, কমনীয়, হাস্যরঞ্জিত মুখ খানি দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতেন।

ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন। তালপুখুর গ্রামের গল্প, বাল্যকালের গল্প, সুধার দরিদ্রা মাতার গল্প, শরতের মাতার গল্প, শরতের ভগিনীর গল্প, অনেক বিষয়ের অনেক গল্প করিতেন। সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি। অন্য সময়ে গর্ব্ব করিয়া যে পরামর্শ শুনি না, সে সময়ে সেই পরামর্শ হৃদয়ে স্থান পায়, অন্য সময়ে যে স্নেহ আমরা তুচ্ছ করি, সে সময়ে সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেন না হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃত বচনে সেইরূপ শান্তিলাভ করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধা সেই অমৃতমাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত, সেই স্নেহময় মধুর প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অথবা ক্লান্ত হইয়া সেই মধুর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিত। যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বালিকার ক্ষীণ বাহুলতা স্বহস্তে ধারণ করিয়া বালিকার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

এক দিন উভয়ে এইরূপে ছাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হেমচন্দ্র ছাদে আসিলেন ও শরৎকে বলিলেন,

"শরৎ, আজ চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যাবে না ?"

শরৎ। "হাঁ; সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কোথাও যাইতে রুচি নাই. না গেলে হয় না "?

হেম। না, সুধার পীড়ার সময় চন্দ্র বাবু ও নবীন বাবু আমাদের অনেক যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, নবীন বাবু ঘরের ছেলের মত আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদেব বাড়ী না গেলেই নয়। আইস এইক্ষণই যাইতে হইবে।

শরৎ ও সুধা উঠিলেন। হেম সুধাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি নামাইলেন, তাহাকে ঘরে শয়ন করাইয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হেম বলিলেন,

"শরৎ, এই পীড়ায় তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, সে ঋণ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এই কারণে তোমার পড়াশুনার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি কলেজে যাও নাই, এক্ষণও তোমাব ভাল পড়া হইতেছে না। একটু মন দিয়া পড়, তোমার পরীক্ষার বড় বিলম্ব নাই।"

শরৎ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "হাঁ আর অল্পই সময় আছে, এখন একটু মন দিয়া লেখাপড়া আবশ্যক। সুধা এখন ভাল হইয়াছে, কিন্তু বিন্দুদিদিকে বলিবেন যখন অবকাশ হইবে, ছাদে লইয়া গিয়া প্রত্যহ গল্প করিয়া সুধার মনটী প্রফুল্ল রাখেন। নবীন বাবু বলিয়াছেন, সুধার মনপ্রফুল্ল থাকিলে শীঘ্র শরীরও পুষ্ট হইবে।" এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর বাসায় পঁহুছিলেন।

নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন সুযোগ্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক হয় নাই; তিনি কৃতবিদ্য, সৎকার্য্যে উৎসাহী. এবং এই বয়সেই একজন হাইকোর্টের গণ্য উকিল হইয়াছিলেন। তিনি সবর্বন মিউনিসিপালিটীর একজন মাননীয় সভ্য ছিলেন এবং সবর্বের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

তাঁহার বাড়ী বৃহৎ নহে কিন্তু পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে নির্ম্মিত

ও রক্ষিত। বাহিরে দুইটী একতালা বৈটকখানা ছিল, বড়টীতে চন্দ্রবাবু বসিতেন, ছোটটী নবীন বাবুর ঘর। বাড়ীর ভিতর দ্বিতল। চন্দ্রবাবুর বৈটকখানায় টেবিল, চৌকি, পুস্তক পরিপূর্ণ দুইটী বুকশেল্ফ, কয়েকখানি সুরুচি সম্মত ছবি। মেজে "মেটিং" করা এবং সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় কোন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ কার্য্যপ্রিয় যুবকের কার্য্যস্থান, পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল।

টেবিলের উপর দুইটী শামাদানে বাতী জ্বলিতেছে; চন্দ্রবাবু, নবীন, হেম ও শরৎ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও অল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় ভদ্র, সুধার পীড়ার সময় তিনি যথা সাধ্য হেমের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত কথা দ্বারা হেমকে তুষ্ট করিতেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র বলিলেন, "কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমার চিরকালই পল্লিগ্রামে বাস, পল্লিগ্রামে কৃতবিদ্য লোক বড় অল্প, আপনাদিগের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ তাহাও অল্প দেখিতে পাই, আপনাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতাও অল্প দেখিতে পাই।"

চন্দ্র। "হেমবাবু দেশহিতৈষিতা কেবল মুখে। অথবা হৃদয়েও যদি সেরূপ বাঞ্ছা থাকে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা ক্ষুদ্র লোক, দেশের জন্য কি করিব? সে ক্ষমতা কৈ? তাহার উপযুক্ত স্থান, কালই বা কৈ?"

হেম। "যাহার যে টুকু ক্ষমতা সে সেইটুকু করিলেই অনেক হয়। শুনিয়াছি আপনি সবর্ব্বান কমিটীর সভ্য হইয়া অনেক কায কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার জন্য অনেক প্রশংসা পাইয়াছেন।"

চন্দ্র। "কায কি? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা বলেন তাহাই হয়, আমরাও তাহাই নির্ব্বাহ করি। কলিকাতার অধিবাসিগণ সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, লর্ড রিপন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরীতে সেই ক্ষমতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন; আমরাও সেই ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতেছি, পাই কি না সন্দেহ।"

হেম। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষমতা আমরা অবশ্যই পাইব, এবং পাইলে আমাদের বিস্তর লাভ।

চন্দ্রনাথ। পাইলে আমাদের যথেষ্ট লাভ তাহার সন্দেহ কি? আমরা দেশশাসন কার্য্য বহু শতাব্দী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি, গ্রামশাসন প্রথাও ভুলিয়াছি, এক্ষণে দলাদলি করা ও পরস্পরকে গালি দেওয়া ভিন্ন আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন নাই! ক্রমে আমরা উন্নত শিক্ষা পাইব, ক্রমে ক্ষমতা পাইব, আমার এরূপ স্থির বিশ্বাস। নিশার পর প্রভাত যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, শিক্ষার পর আমাদিগের ক্ষমতা বিস্তারও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

শরৎ। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম, আমারও হৃদয়ে এইরূপ আশা উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের এই কঠোর চেষ্টাতে কে একটু সহানুভূতি করে? আমাদিগের উচ্চাভিলাষ অন্যের বিদ্রূপের বিষয়, আমাদিগের চেষ্টার বিফলতা তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়, আমাদিগের জাতীয় চেষ্টা, জাতীয় অভিলাষ, জাতীয় জীবন তাঁহাদিগের উপহাসের অনন্ত ভাণ্ডার। মৃতবৎ জাতি যখন পুনরায় জীবনলাভের জন্য একটু আশা করে, একটু চেষ্টা করে, তখন তাহারা কি অন্যের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শরৎ, তোমার বয়সে আমিও ঐরূপ চিন্তা করিতাম, সংবাদ পত্রে একটী বিদ্রূপ দেখিলে ব্যথিত হইতাম। কিন্তু দেখ, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি ফাঁপা মাল, দেখিতে বড় সুন্দর, তত মূল্যবান্ নহে। যদি সে গুলি দিতে অন্যের বড়ই কষ্ট হয়, তাঁহারা বাক্‌সে বন্ধ করিয়া রাখুন, আমাদের আবশ্যক নাই। যদি উপহাস করিতেই তাঁহা-দিগের ভাল লাগে, তাঁহাদিগের উপহাসই আমাদিগের জাতীয় জীবনের বন্ধনীস্বরূপ হউক। শরৎ, আমাদিগের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা ও সত্তার উপর নির্ভর করে, অন্য লোকের হস্তে নহে। আইস, আমরা কার্য্যদক্ষতা শিক্ষা করি, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রতীক্ষা না করিয়া, উপহাস গ্রাহ্য না করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইব। আমাদিগের উন্নতির পথ অবারিত।"

নবীন। আমারও বিশ্বাস আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু

সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশৎ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।

চন্দ্র। নবীন, আমি এটী গুণ বলিয়া মনে করি, দোষ বলিয়া মনে করি না। যে সমাজ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হয়, সে সমাজ শীঘ্র বিপ্লবগ্রস্ত হয়। তুমি ফরাসীদের ইতিহাস বেশ জান, একশত বৎসর হইল ফরাসীরা একেবারে সমস্ত কুরীতি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; তাহার ফল, ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব! শীঘ্র শীঘ্র সমাজের রীতি পরিবর্ত্তন করায় সমাজের লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি আছে।

নবীন। কিন্তু যে প্রথাগুলি এক্ষণে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে, সে গুলি কি ত্যাগ করা বিধেয় নহে?

চন্দ্র। অনেক আলোচনা করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়াই সেগুলির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। আলোচনায়ও বিশেষ উপকার হয় বোধ হয় না; সমাজে জীবন থাকিলে লোকে আপনা আপনিই সুবিধা বুঝিয়া অনিষ্টকর নিয়মগুলি ত্যাগ করে। জীবিত সমাজের এই নিয়ম;—তাহার ক্রমশঃ সংস্কার আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

নবীন। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজেও সংস্কার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জীবন অতিশয় ক্ষীণ, সেই জন্য গতি অতিশয় অল্প। দেখুন বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের কত অল্প উন্নতি হইতেছে। এ বিষয়ে উন্নতিতে নূতন আইনের আবশ্যক নাই, রাজার অনুজ্ঞার আবশ্যক নাই, সমাজের রীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, একটু চেষ্টা হইলেই হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কত বিরল। আপনাদিগের দেশের তুলা লইয়া আপনারা কাপড় নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না, ইউরোপ হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসিতেছে তাঁতিদের দিন দিন দুরবস্থা হইতেছে।

হেম। কলে নির্ম্মিত কাপড়ের সহিত, তাঁতিরা হাতে কায করিয়া

কথনও যে পারিয়া উঠিবে এরূপ আমার বোধ হয় না। আমি পল্লিগ্রামে অনেক হাটে গিয়াছি, অনেক গরিব লোকের বাড়ী গিয়াছি। আমার মনে আছে পূর্ব্বে সকল ঘরেই চরকা চলিত, এক্ষণে গ্রামে একখানা চরকা দেখা যায় না। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট বিলাতি স্থতা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। হাটে যে দেশী কাপড় ১৷৷০ টাকায় বিক্রয় হয় সেইরূপ বিলাতী কাপড় ৸৵০ আনায় বিক্রয় হয়। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহারা অল্প মূল্যে ভাল কাপড় পরিতে পারে, কিন্তু তাঁতীরা হাতে কায করিয়া কথনও কলের কাযের সঙ্গে পারিবে তাহা বোধ হয় না।”

নবীন। “আমিও তাহাই বলিতেছি, স্থসভ্য জগতে হাতের কায উঠিয়া যাইতেছে, এক্ষণে কলে কায করা ভিন্ন উপায় নাই। তবে আমরা বঙ্গদেশ এইরূপ কলে আচ্ছন্ন করি না কেন? আমাদের কি সেটুকু উৎসাহ নাই, সেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি নাই?”

চন্দ্র। “নবীন, সে বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নহে, সে অর্থের অভাব, বহু অর্থ না হইলে একটী কল চলে না। আর একটী আমাদের শিক্ষার অভাব আছে, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া এখনও কায করিতে শিখি নাই, এই শিক্ষাই সভ্যতার প্রধান সহায়। দেখ বিদ্যায় আমাদের দেশে অনেকে উন্নত হইয়াছেন, ধনে অনেকে উন্নত, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনেকে উন্নত, রাজনীতিতে অনেকে উন্নত। বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কায করা একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা, সেটী আমরা এথনও শিথি নাই। পাঁচজন বিদ্বান একত্রে মিলিয়া একটী মহৎ চেষ্টা করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না, পাচজন রাজনীতিজ্ঞ ঐক্য সাধন করিতে পারে না, পাঁচজন ধনী মিলিয়া বাণিজ্য করে এরূপ বিরল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কিন্তু আমি ভরসা করি অন্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষাও আমরা লাভ করিব, এ শিক্ষা লাভ না করিলে সভ্যতার আশা নাই।”

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভৃত্যে আসিয়া বলিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে পুনরায় সকলে বাহিরে আসিলেন। আর ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া হেম ও শরৎ বিদায় লইলেন।

শরৎ আপনার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, হেম চন্দ্রনাথ বাবুর কথাগুলি অনেক্ষণ চিন্তা করিতে কবিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। পথে সুন্দর চন্দ্রালোক পড়িয়াছে, নিশার বায়ু শীতল ও মোনোহর, হেমচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বালীগঞ্জের দিকে গিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটী শকটের শব্দ পাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন দুইটী উজ্জ্বল আলোকযুক্ত একটী বড় গাড়ী তীব্র বেগে আসিতেছে, বলবান্ শ্বেতবর্ণ অশ্বদয় যেন পৃথিবী স্পর্ষ না করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, ফেটন ঘর্ঘর শব্দে দরিদ্র হেমের পাশ দিয়া যাইয়া একটী বাগানের ফাটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর আবার আর একটী জুড়ী আসিল, দুইটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব এক বৃহৎ লেণ্ডলেট লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে সেই ফাটকে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় নারী কণ্ঠ সম্ভুত খল খল হাস্যধ্বনি হেমের শ্রুতি পথে পঁহুছিল।

হেম একটু উৎসুখ হইলেন, এবং সবিশেষ দেখিবার জন্য বাগানের ফাটকের কাছে আসিলেন। দেখিলেন ফাটকে রামসিং ফতেসিং বলবন্তসিং প্রভৃতি শ্মশ্রুধারী দ্বারবান্গণ সগর্ব্বে পদচারণ করিতেছে। বাগানের ভিতর অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, দুই একটী সুন্দর জলাশয়। তাহার পর একটী উন্নত অট্টালিকা। অট্টালিকা ইন্দ্রপুরীতুল্য, তাহার প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকরাশি বহির্ভূত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যধ্বনি ও নারীকণ্ঠ সম্ভূত গীতধ্বনি গগনপথে উত্থিত হইতেছে!

হেম ধীরে ধীরে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাগান কার বাপু?"

দ্বারবান্ দাড়ীতে একবার মোচড় দিয়া গোঁফে একবার তা দিয়া বলিল,

"এ বাগান তুমি জানে না, মুলুক কা সব বড়া বড়া লোক জানে, তুমি জানে না? তুমি কি নয়া আদমী আছে?"

হেম। "হাঁ বাপু, আমি নতুন মানুষ, এদিকে কখনও আসি নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

দ্বার। "সোই হোবে। এখানে সব কোই এ বাগান জানে। কল-

কত্তাকা যেত্তা বড়া বড়া বাঙ্গালি আছে, জমীদার, উকিল, কৌঁসিলি, সব এ বাগানে আসে, সব কোই এ বাগান জানে।”

হেম। “তা হবে বাপ, আমি গরিব লোক আমি সে সব কথা কেমন কোরে জানব?”

দ্বার। “হাঁ সো ঠিক, সো ঠিক, তোমারা লায়েক আদমি এ বাগান জানে না। আজ বড়া নাচ হোবে, বহুত বাবু লোক আসেছে, বড়া তামাসা।”

হেম। “তা নাচ দিচ্চে কে? বাগানটা কার?”

দ্বার। “ধনপুরকা জমিদার ধনঞ্জয় বাবু।”

হেমের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

“হা হতভাগিনী উমাতারা! ধনে যদি সুখ থাকিত, মর্ম্মর শোভিত ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে যদি সুখ থাকিত, সাদা জুড়ি ও কাল জুড়িতে যদি সুখ থাকিত, তবে তুমি আজ হতভাগিনী কেন?”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধনঞ্জয় বাবু।

যে দিন রাত্রিতে হেমবাবু ধনঞ্জয় বাবুর বাগান দেখিয়া আসিলেন সেই দিন অবধি তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ রহিলেন। সহসা সে কথা বিন্দুকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, পাছে বিন্দু উমাতারার জন্য মনে ব্যথা পান; এবং বিন্দুর নিকট হইতে কথাটী গোপন রাখিতেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কি করিবেন? কি উপায় অবলম্বন করিবেন? হতভাগিনী উমতারার সংবাদ কি রূপে লইবেন? উমাতারার কোনও রূপ সহায়তা করা কি তাঁহার সাধ্য?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী যাবেন ঠিক করি-

লেন। ধনঞ্জয় বাবু বাল্যকালে যখন তালপুখুরে আসিতেন তখন হেমকে বড় মান্য করিতেন, সম্ভবতঃ এখনও হেমের দুই একটী পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পারেন। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি একবার স্বচক্ষে উমাতারার অবস্থা দেখিয়া আসা হবে, তাহার পর যথোচিত উপায় বিধান করা যাইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বাবুর সহিত সহসা দেখা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা মহানগরীতে ধনঞ্জয় বাবুর বড় মান, অনেক বন্ধু, অনেক কাযের ঝনঝট্ তাঁহার সহিত হেমের ন্যায় সামান্য লোকের দেখা হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। হেমের গাড়ী নাই, তিনি এক দিন সকালে হাঁটিয়া ধনঞ্জয় বাবুর কলিকাতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে গেলেন। দ্বারে দ্বারবানগণ একজন সামান্য পথশ্রান্ত বাবুর কথায় বড় গা করে না, কেহ কোনও উত্তর দেয় না, খাটিয়া রূপ সিংহাসন থেকে কেহ শীঘ্র উঠে না। কেহ গা ভাঙ্গিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ দাল বাছিতেছে, কেহ বা বাড়ীর দাসীর সহিত দুই একটী মধুর মিষ্টালাপ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজন অনুগ্রহ করিয়া হেমের দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,

"কেয়া হয় বাবু? তুমি সকাল থেকে বসে আছে, কি চাই কি?"

হেম। "বলি একবার ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারে? অনেক দূর থেকে এসেছি, একবার খবর দাও না, বল তালপুখুর গ্রাম থেকে হেমবাবু দেখা করিতে এসেছেন?"

দ্বার। "গ্রামের লোক ঢের আসে, বাবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, বাবুর অনেক কায।"

হেম। "তবু একবার খবর দাও না, বড় প্রয়োজনে আসিয়াছি, একবার দেখা হলে ভাল হয়।"

দ্বার। "প্রয়োজনে সকলে আসে, বাবুর কাছে এখন সকল গ্রামের লোকের প্রয়োজন আছে, সকলেই কিছু আশা করে। তোমার কি গ্রাম শালপুখুর, সে মুলুকে বড় শালবন আছে?"

হেম। "না হে দরওয়ানজী, শালপুখুর নয় তালপুখুর, তোমাদের বাবুর শশুর বাড়ী সেই গ্রামে।"

তখন একটী খাটিয়ায় অৰ্দ্ধ শয়ান দ্বিতীয় এক মহাপুরুষ একবার হাই তুলিয়া অৰ্দ্ধেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,

"হাঁ হাঁ আমি জানে, সে তালপুখুর গ্রামে বাবু সাদী করিয়াছেন। তুমি বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক আছে?"

হেম। "সেই গ্রামের লোক বটে, বাবুর সঙ্গে সম্পর্কও আছে।"

তখন দুই তিনজন বিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী ক্ষণেক পরামর্শ করিল। একজন কহিল, গ্রামে থেকে অনেক কাঙ্গালী আসে, তাড়াইয়া দাও। আর এক জন কহিল না শ্বশুর বাড়ীর লোক, সহসা তাড়াইয়া দেওয়া হয় না, মা শুনিলে রাগ করিবেন। তৃতীয় একজন নিষ্পত্তি করিল, আচ্ছা একটু বসিতে বল। হেমবাবু আবার ক্ষনেক বসিলেন। তিনি একটু চিন্তাশীল সমালোচনাপ্রিয় লোক ছিলেন, বড় মানুষের দ্বারবানদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতা বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইলেন, এবং তাহা হইতে পরম প্রীতি ও উপদেশ লাভ করিলেন।

দ্বারবানগণ দেখিল এ কাঙ্গালী যায় না। তখন একজন অগত্যা বহু সুখের আধার খাটিয়া অনেক কষ্টে ত্যাগ করিয়া একবার হাই তুলিয়া, একবার অসুরতুল্য বাহুদ্বয় আকাশের দিকে বিস্তার করিয়া আর একবার শ্মশ্রুকণ্ডূয়ন করিয়া ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

হেম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় একদণ্ড পর দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া সুখবর দিলেন "যাও বাবু এখন দেখা না হোবে।"

হেম "আমার নাম বলিয়াছিলে?"

দ্বারবান "নাম কি বলিবে? এত সকালে কি বাবুর সঙ্গে দেখা হোয়? বাবু এখনও উঠেন নাই, দশটার সময় উঠেন, তাহার পর আসিও।" হেম অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

একদিন দশটার পর গেলেন, তখন বাবু বাড়ী নাই। এক দিন অপরাহ্নে গেলেন, বাবু বাগানে বাহির হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় গেলেন, সেদিন বাবু কোথা নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। চার পাঁচ দিন বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আবার গেলেন, ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় বাবু বাড়ী আছেন।

দ্বারবান বলিল "কি নাম তোমার? গোবৰ্দ্ধন না গৌরচন্দ্র?"

হেম। "নাম হেমচন্দ্র, তালপুকুর গ্রাম হইতে আসিয়াছি"।

দ্বারবান উপরে যাইয়া খবর দিল। আসিয়া বলিল "উপরে যান।" হেমচন্দ্র উপরে গেলেন।

ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের ধনবান্ উত্তরাধিকারী, গৌরবর্ণ, সুন্দর, যৌবনোপেত ধনঞ্জয় বাবু কয়েকজন পাত্র মিত্রের মধ্যে সেই সুন্দর সভাগৃহে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শিষ্টাচার করিয়া আপন শ্যালীপতি ভ্রাতাকে মকমল মণ্ডিত সোফায় বসিতে আজ্ঞা দিলেন। হেমচন্দ্র যাহার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন।

হেমবাবু সহসা কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না, সে সভাগৃহের শোভা দেখিয়া ক্ষণেক বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তিনি চৌরঙ্গিতে প্রাসাদ তুল্য বাটী সমূহের বারাণ্ডায় টানাপাখা চলিতেছে, পথ হইতে দেখিয়াছেন; লাট সাহেবের বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন; উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দুই একটী ইংরাজি দোকানের অভ্যন্তর একটু একটু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশোভিত সুন্দর সভাগৃহের ভিতর পদবিক্ষেপ করা তাঁহার কপালে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই! সভার মেজে সুন্দর কার্পেট মণ্ডিত, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, ডালে ডালে পাখী বসিয়াছে, সে কার্পেটের উপর হেমচন্দ্র ধূলিপূর্ণ তালি-দেওয়া জুতা স্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার উপর আবলুশ কাষ্ঠের সোফা, অটোমান্ চৌকি, ইসিচেয়র, সাইডবোর্ড, ওয়াটনট; আবলুশ কাষ্ঠের উপর স্বর্ণের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বড় শোভা পাইতেছে। সোফা ও চৌকি হরিৎবর্ণ মকমলে মণ্ডিত, হেমের ছেলে দুটী সেরূপ মকমলের জামা কখন পরিধান করে নাই। মার্বেলের টেবিল, মার্বেলের সাইডবোর্ড, মার্বেলের প্রতিমূর্ত্তিগুলি! উপর হইতে বেলওয়ারীর ঝাড়ের ভিতর গেসের আলোক দীপ্ত রহিয়াছে, সে আলোকে ঘর দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, গবাক্ষ দিয়া সে আলোক বাহির হইয়া সে পাড়া সুদ্ধ আলোকিত করিয়াছে। একদিকে কোনে সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে, সাইডবোর্ডে, দুইটী ডিকেণ্টর ও কয়েকটী গেলাস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেয়ালে

অসংখ্য বড় বড় দর্পনে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে, হেমের দরিদ্র চেহারাখানি চারিদিকের দর্পনে অঙ্কিত দেখিয়া সে দরিদ্র আরও লজ্জিত হইলেন। কয়েকখানি সুন্দর বহু মূল্য অয়েল পেণ্টিং; ইন্দ্রপুরী হইতে বিবস্ত্রা মেনকা রম্ভা যেন সেই অয়েল পেণ্টিং হইতে হাস্য করিতেছে!

সভাগৃহের বর্ণনা এক প্রকার হইল, সভ্য দিগের বর্ণনা করি কিরূপে? আজ অধিক লোক নাই তথাপি ধনঞ্জয় বাবুর অতি প্রিয় অতি গুণবান্ কয়েকজন বন্ধু সে সভাকে নবরত্ন সভা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যথেষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব, দুই একটী কথায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্তে সুমতি বাবু বসিয়াছিলেন, তিনি রূপবান্ যুবা পুরুষ, বয়স ঠিক জানি না, কিন্তু যৌবনের শোভা সে সুন্দর মুখে. সে কালাপেড়ে কাপড়ে ও ফিন্‌ফিনে একলাইয়ে লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় জানি না, কিন্তু প্রায় বড় মানুষ দিগের দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্থান। তিনি গীতে অদ্বিতীয়, হাস্য রহস্যে অদ্বিতীয়, ধনী দিগের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়, প্রবাদ আছে যে বিষয় বুদ্ধিতে ও অদ্বিতীয়.! মধু মক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিতে জানিতেন, অনেক মধুচক্র হইতে মধু আহরণে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়াছিল, সুন্দর গাড়ী ও জুড়িতে ছাপিয়া পড়িতেছিল। প্রবাদ আছে যে বণ্ড. হেণ্ডনোট প্রভৃতি গূঢ় মন্ত্রে তিনি বিশেষরূপে দীক্ষিত, নাবালক বা তরুণ ধনী দিগের প্রতি সেই সুন্দর মন্ত্র চালনায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু এ সকল জনপ্রবাদ গ্রাহ্য নহে, সুমতি বাবুর মিষ্ট হাস্য ও আলাপ-ক্ষমতা সন্দেহ বিবর্জিত।

সুমতি বাবুর পার্শ্বে যদুনাথ বসিয়াছিলেন,—গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্যরহস্য ক্ষমতা বল,—যদুনাথের ন্যায় কলিকাতায় কে আছে? ব্যবসা ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চাল চোল, ইংরাজী খানায়, ইংরাজী ধরণে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? সেম্পেন বা পোটরণ্ বা সাব্‌লীস্ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? আবার বক্তৃতা ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ,—"ন্যাশনালিটী" রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথ বাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের

উচ্চাভিলাষ, যদুনাথ বাবুর সহিত বন্ধুতা করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথ বাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন!

তাঁহার পশ্চাতে চাপকান পরিয়া সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া হরিশঙ্কর বাবু একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি সেকেলে লোক, ইংরাজী বড জানেন না, কিন্তু বাহাদুরি কেমন? কোন ইংরাজীওয়ালা তাঁহার ন্যায় চাকুরি পাইয়াছে? তিনি মাথায় সাদা ফেট্টা বাঁধিয়া আপিসে যান, পুরাণধাঁচে ইংরাজি কহেন, বড় বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র। প্রাচীন হিন্দুসমাজের এই স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর বাবুকে সাহেবরা বড় স্নেহ করেন, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে হরিশঙ্কর বাবুকে মূর্ত্তিমান্ বেদ মনে করেন, হিঁদুয়ানি ও সাবেক রকম রীতি নীতি বজায় রাখিবার একটী প্রধান কারণ মনে করেন, নব্য উদ্ধত যুবকদিগকে হরিশঙ্কর বাবুর উদাহরণ দেখান! হরিশঙ্কর বাবু লোকটী বিচক্ষণ, দেখিলেন এই চালে চলিলেই লাভ, সুতরাং সেই চালই আরও অনুবর্ত্তন করিলেন। তাহার সুফল শীঘ্র ফলিল, ধর্ম্মপতি রাজ-পুরুষেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীকে অনেক শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপরে একটী বড় চাকুরি দিলেন। সাবেক রীতিনীতির স্তম্ভ মনে মনে একটু হাসিলেন, সন্ধ্যার সময় ইয়ারদিগের নিকট এই কথা গল্প করিয়া, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি সুধার উৎস বহিল।

হরিশঙ্কর বাবুর এক পার্শ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর" কর্ম্মকার বসিয়াছেন, তাঁহার কোট পেণ্টলুন অনিন্দনীয়, চখের চসমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরির গেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজি বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরণ বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয় বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন। সুমতি বাবু কখন কখন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনিন্দনীয় পরিচ্ছেদ দেখিয়া ইয়ারদিগের নিকট বলিতেন, "এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থ বুঝিলাম, মিষ্টর কর্ম্মকারের মুখের কান্তি অপেক্ষা পশ্চাতের শোভাটাই কিছু অধিক।"

হরিশঙ্কর বাবুর অপর পার্শ্বে বিশ্বম্ভর বাবু বসিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাড়ার মধ্যে বড় মানুষ, দলের মধ্যে দলপতি,—বড় হাউসের বড় বেনিয়ান!

তাঁহার অর্থের ন্যায় কাহার অর্থ, তাঁহার নূতন বাড়ীর ন্যায় কাহার বাড়ী তাঁহার গাড়ী ঘোড়ার ন্যায় কাহার গাড়ী ঘোড়া? তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর বাবু গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি ঘনিয়াদী বড়মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন,— তাঁহাদের গৌরব বর্ণনায় আমরা অক্ষম।

ধনস্বরূপ পদ্মবনের চারিদিকে মধুমক্ষিকাগণ গুণ গুণ করিতেছে; ধন-স্বরূপ ময়ূরসিংহাসনে রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! হেমবাবু কয়েক মাস কলিকাতায় বাস করিয়া দেখিলেন, কেবল ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী নহে, চারিদিকেই সমাজ এ রত্নরাজিতে মণ্ডিত রহিয়াছে! এ মহা নগরী এই রত্নপ্রভায় ঝলসিত হইতেছে!

এ সভায় হেমচন্দ্র কি বলিবেন? হংস মধ্যে বকো যথা হইয়া তিনি ক্ষণেক সেইখানে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। একবার কষ্ট করিয়া ধনঞ্জয় বাবুর বাগানের কথা উত্থাপন করিলেন, তখনই সভাসদ্ সহস্রমুখে সেই বাগানের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় বাবু হেমবাবুকে একদিন বাগানে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনুগৃহীত করিলেন; হেম অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। একবার তালপুখুরের কথা উচ্চারণ করিলেন, ধনঞ্জয় বর্দ্ধমানের নাজীরের কথা উত্থাপনে একটু মুখ হেঁট করিলেন,—সে কথায় কেহ বড় গা করিলেন না। সভাসদ্গণ একটু অধীর হইতে লাগিলেন, কেহ সেতার লইয়া কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ সাইডবোর্ডে ডিকেণ্টরের দিকে চাহিলেন, কেহ ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। হেমচন্দ্র ভাব গতিক বুঝিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী-ভিতর একবার যাবেন কি? ধনঞ্জয় ত তাঁহাকে একবার বাড়ী-ভিতর যাইবার কথা বলিলেন না। তথাপি হতভাগিনী উমাতারাকে না দেখিয়া কি চলিয়া যাবেন?

প্রাঙ্গনে আসিয়া হেমচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এমন সময়ে বাহিরে ঘর্ঘর শব্দে আর দুই একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! গাড়ী হইতে হাস্যরবে বাটী ধ্বনিত করিয়া কাহারা বাবুর বৈটকখানায় গেল। সভা জমিল, সেতারেব বাদ্য শ্রুত হইল আবার মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল,— অচিরে কলকণ্ঠজাত গীতধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

হেম এক পা দু পা করিয়া একটী প্রাচীর পার হইয়া বাড়ী-ভিতরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছেন! তথায় শব্দ নাই, আলোক নাই, মনুষ্য চিহ্ন নাই, মনুষ্য রব নাই। অন্ধকারে ক্ষনেক প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিবেন কি?

একটী উন্নত প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী দীপ দেখা যাই-তেছে, হেম অনেকক্ষণ সেই দীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সাড়া দিবার সাহস হইয়া উঠিল না।

ক্ষণেক পর একটী ক্ষীণ বাহু সেই গবাক্ষ লক্ষিত হইল। ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ বদ্ধ হইল, আলোক আর দৃষ্ট হইল না, সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী।

হেমচন্দ্র বাটি আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কায করিয়াছি, নারীর যাতনার সময় নারীই শান্ত্বনা দিতে পারে। আমি সমস্ত কথা স্ত্রীর নিকট কহিব, তিনি যাহা পারেন করুন।"

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বিন্দু দেখিলেন হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল অতিশয় গম্ভীর অতিশয় ম্লান। ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন

"আজ কি হয়েছে গা? তোমার মুখখানি অমন হয়ে গিয়েছে কেন?"

হেম। "বলিতেছি, বস। সুধা শুইয়াছে?"

বিন্দু। "সুধা খাওয়া দাওয়া করিয়া শুয়েছে। কোনও মন্দ খবর পাও নাই?"

হেম। "শুন, বলিতেছি।" এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে, হেমচন্দ্র আদ্যপান্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, বিন্দুর নিকট বলিলেন।

আঁচল দিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া বলিল, "এটী হবে তাহা আমি জানিতাম, অভাগিনী উমা তাহা জানিত।"

হেম "কেমন করিয়া?"

বিন্দু। "তা জানি না, বোধ হয় কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিল, সে চাপা মেয়ে, কোনও কথা শীঘ্র বলে না, কিন্তু তালপুখুর থেকে আসিবার সময় সে অভাগিনীর কান্না কাঁদিয়াছিল।"

হেম। "এখন উপায়? যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে ধনেশ্বরের কুলের ধন দুই বৎসরে লোপ হইবে, ধনঞ্জয় রোগগ্রস্থ হইবে, উমা দুই বৎসরে পথের কাঙ্গালিনী হইবে।"

বিন্দু। "সে ত দুই বৎসরের পরের কথা, এখন উমা কেমন আছে? সে সভাবতঃ অভিমানিনী, স্বামীর আচরণ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে? তালপুকুর হইতে আসিয়া সেই বড় বাড়ীতে ছেলে মানুষ একা কেমন করিয়া আছে? তার ছেলে পুলে নেই, বন্ধু বান্ধব যে কেউ নেই, যার কাছে মনের কথা বলে। তুমি কেন একবার গিয়ে দুটো কথা কহিয়া আসিলে না?"

হেম। "আমার ভরসা হইল না,—তুমি একবার যাও,—তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর, তার পর ভগবান আছেন।"

তাহার পর দিন খাওয়া দাওয়ার পর, ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু একটী পালকি করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন। সুধা ও উমাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া উৎসুক হইল, কিন্তু বিন্দু বলিলেন "আজ নয় বন, আর একদিন যদি পারি তোমাকে লইয়া যাইব।"

প্রশস্ত শয়ন কক্ষে গিয়া বিন্দু দেখিলেন উমা একা বসিয়া একটী চুলের দড়ি বিনাইতেছে, দাস দাসী সকলে নীচে আছে। উমাকে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই তালপুকুরের উমা যাহার সৌন্দর্য্য কথা দিক্ বিদিক্ প্রচার হইয়াছিল? মুখের রং কালো হইয়া গিয়াছে, চক্ষে কালী পড়িয়াছে, কণ্ঠা দুটা বেরিয়ে পড়েছে, বাহু অতিশয় শীর্ণ, শরীর খানি দড়ীর মত হয়ে গিয়াছে। চারিমাস

পূর্ব্বে বিন্দু যাহাকে প্রথম যৌবনের লাবণ্যে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ত্রিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর দিয়া তারা হার লম্বমান রহিয়াছে, বহু মূল্য বালা দুগাছী সে শীর্ণ হস্তে চল চল করিতেছে।

উমা পদশব্দ শুনিয়া সেই ম্লান চক্ষুর সহিত পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন। বিন্দুকে দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন। ম্লান বদনে ধীরে ধীরে কহিলেন "আঃ বিন্দু দিদি, তুমি এসেছ, আমি কত দিন তোমার কথা মনে করেছি। তুমি ভাল আছ? ছেলেরা ভাল আছে?"

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাঁহার চারি মাসের ইতিহাস অনুভব করিলেন। যত্নে হৃদয়ের উদ্বেগ সঙ্গোপন করিয়া উমার হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,

"হেঁ বন্, আমরা সকলে ভাল আছি, সুধার বড় জ্বর হয়েছিল, তা সে ও ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ উমা? তোমাকে একটু কাহিল দেখচি কেন বন?"

উমা। "ও কিছু নয় বিন্দুদিদি,—আমার ও কলিকাতায় আসিয়া আমাসা হয়েছিল তা ভাল হয়েছে, এখন একটু কাশি আছে, বোধ হয় কলকেতার জল আমাদের সয় না, আমরা তালপুখুরেই ভাল থাকি।" সেই নীরস ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাস্য লক্ষিত হইল।

বিন্দু। "তালপুখুরে আবার যেতে ইচ্ছা করে? আমরা এই পূজার পর যাব, তুমি যাবে কি?"

উমা। "তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দুদিদি, বাবু কি তাতে মত করবেন? বোধ হয় না"।

বিন্দু। "তবে তোমাকে এখানে দেখবে শুনবে কে? আমরা রইলুম অনেক দূরে, আর ছেলেদের ফেলেও ত সর্ব্বদা আসিতে পারিনি। তোমার ও কাশী করেছে, রোগা হয়ে গিয়েছ, তোমাকে দেখে কে?"

উমা। "কেন বিন্দুদিদি, রোজ ডাক্তর আসে, বাবু একজন ভাল ডাক্তর রাখিয়া দিয়েছেন সে ওষুধ দিচ্চে, আমি এখন ওষুধ খাই।"

বিন্দু। "তা যেন হোল, কিন্তু তবু আপনার লোক না হলে কি কেউ

দেখতে শুনতে পারে? আর তোমার অসুখ হলে সংসারই দেখে কে? তা জেঠাই মাকে কেন লেখ না, তিনি এসে কয়েক দিন থাকুন। আবার তুমি একটু সারলে তিনি চলে যাবেন, তুমিও না হয় দিনকতক গিয়ে তালপুখুরে থাকবে।"

উমা। "না মাকে আর কেন আনান, আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হইতেছে, আর সংসারে অনেক চাকর দাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্চে না ত, মাকে কেন ডাকান?"

বিন্দু। "না তবু বোধ হয় তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে, তেমন কি আর কেউ পারে, হাজার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয় বাবু তোমাকে যত্নটত্ন করেন ত?"

অতি ক্ষীণস্বরে উমা উত্তর করিলেন, "হাঁ তা আমার যখন যা আবশ্যক, তখনই পাই,—কিছুর অভাব নেই। যত্ন করেন বৈ কি।"

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত যাতনার কথা কহিতে চাহে না;—উমার ইহ জগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ হইয়াছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,

"না উমা, আমার বোধ হয় জেঠাইমা এখানে আসিয়া কয়েক দিন থাকিলে ভাল হয়। দেখ আমাদের সুখ দুঃখ, ব্যারাম সেরাম সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক যতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুধার ব্যারাম হল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন কত সুশ্রুষা করিল, তবে আরাম হল। তুমিও বন বড় কাহিল হয়ে গিয়েছ, সর্ব্বদা কাশ্‌ছ, এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বন্, জেঠাই মাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমায় বল আমিই লিখচি। আহা উমা তুমি কি ছিলে বন আর কি হয়ে গিয়েছ।" এই বলিয়া বিন্দু সস্নেহে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এই টুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পান নাই,—এই টুকুতে তাঁহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন "বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল

বাস''—আর কথা বাহির হইল না,—উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন, "উমা তুমি কি আমাকে ভাল বাস না?"

উমা। "বাসি, যতদিন বাঁচিব, তোমাকে ভাল বাসিব।"

বিন্দু। "তবে বন্ আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝি নাই? জগতের তোমার সুখের আশা শেষ হইয়াছে তাহা কি আমি বুঝি নাই? বিবাহের পর যে প্রণয়ে তুমি ভাসিতে, আমার সহিত দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলিতে, সে প্রণয় সুখ শেষ হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি নাই। উমা তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাইতেছ? আমি কি পর? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই তবে জগতে আপনার লোক কে আছে?"

এ স্নেহ বাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দু দিদির হৃদয়ে মুখ খানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরে কাঁদিল।

অশ্রুসিক্ত মুখ খানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণ স্বরে বরিলেন "বিন্দু দিদি তোমার কাছে আমি কখন কিছু লুকাই নাই, কখন ও লুকাইব না। কিন্তু আজ ক্ষমা কর, এ সব কথা আর একদিন বলিব।"

বিন্দু। "উমা, আমি আজই শুনিব। মনের দুঃখ মনে রাখিলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বলিলে একটু শান্তি বোধ হয়।"

উমা। "কি বলিব বল?"

বিন্দু। "আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনঞ্জয় বাবু কি এখন তেমন যত্ন টত্ন করেন?"

উমা। "বিন্দু দিদি, আমার যখন যা দরবার হয় সবই পাই, আমার রোগের চিকিৎসা করাইতেছেন, যত্ন নাই কেমন করে বলিব?"

বিন্দু। "উমা তুমি কি আমাকে পুরুষ মানুষ পাইয়াছ যে ঐ কথায় ভুলাই-তেছ। ভাত কাপড় ও ঔষধে কি স্বামীর যত্ন? আমি সে যত্নের কথা বলি

নাই। ধনঞ্জয় বাবু কি পূর্ব্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্ব্বের মত কি খুলিয়া তোমাকে ভাল বাসেন, পূর্ব্বের মত কি তোমার ভাল বাসায় সুখী হয়েন। উমা মেয়েমানুষের কাছে মেয়ে মানুষের কি এ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমানুষের জবীন, সে স্নেহটী কি তোমার আছে?"

হতভাগিনী উমা "না" কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটী আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "উমা, সে ধনটী হারাইলে ত চলিবে না, সে ধনটী রাখিবার জন্য কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে?"

উমা। "ভগবান জানেন আমার ভালবাসা কমে নাই, তাঁহাকে এখন ও চক্ষে দেখিলে আমার শরীর জুড়ায়।"

বিন্দু। "উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা, এ জীবনে তোমার ভালবাসার হ্রাস হইবে না। কিন্তু দেখ বন, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসার ও চলে না। মেয়েমানুষের আর ও কিছু কর্ত্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখিতে হয়।"

উমা। "বিন্দুদিদি, যিনি আমাদিগকে খেতে পরিতে দেন, যিনি আমাদিগের প্রথম গুরু, তাঁহাকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি দেয় আছে।"

বিন্দু। "উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম্ম, কিছু তাহা ভিন্ন ও আমাদের কিছু শিখিতে হয়। তা না হইলে সংসার চলে না। যিনি আমাদের জন্য এত করেন তাঁহার মনটী সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাঁহার গৃহটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য আমরা যেন একটু যত্ন করিতে শিখি। অনেক সময় একটী মিষ্ট কথায় ক্ষোভ নিবারণ হয়, একটী মিষ্ট কথায় ক্রোধ শান্তি হয়, আমাদের একটু যত্ন ও প্রফুল্লতায় সংসারটী প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জ্বালা যদি একটু সহ্য করিতে শিখি, ক্রোধ একটু সম্বরণ করিতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করিয়া ক্ষমা গুণ শিখি, তাহা হইলে সংসারটী বজায় থাকে, না হইলে জীবন তিক্ত হয়। উমা আমি অনেক নির্দ্দোষ

চরিত্র পুরুষ ও নির্দ্দোষ চরিত্রা নারী দেখিয়াছি, তাহাদিগের ভালবাসার ও অভাব নাই, তথাপি তাহাদিগের সংসার শ্মশান ভূমি, জিবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণ গুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসার ও কণ্টকময় হয়। অনেক বিলম্বে লোকে ভ্রম বুঝিতে পারে, তখন মনে আক্ষেপ উদয় হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে এ জীবনে কত সুখ হইতে পারিত। কিন্তু তখন অবসর চলিয়া গিয়াছে, প্রণয় একবার ধ্বংশ হইলে আর আসে না, জীবনের খেলা একবার সঙ্গে হইলে আর সে খেলা আরম্ভ করিতে আমাদের অধিকার নাই।”

উমা। “বিন্দুদিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম, তালপুকুরে তোমার দরিদ্র সংসার দেখিয়া এ শিক্ষাটী আমি শিখিয়াছি, ভগবান জানেন ইহাতে আমারত্রুটী হয় নাই। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলিত, কিন্তু যিনি আমার গুরু' তিনিই আমাকে সর্ব্বদা মুক্তাহার ও হিরকাভরণ পরিতে দেখিতে ভাল বাসিতেন, সেই জন্য আমি পরিতাম, এই মাত্র আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বলিত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সেরূপে স্বামী একদিন তুষ্ট ছিলেন সেই জন্য আমার অভিমান;—তাঁহাকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন আমি এই যত্ন দ্বিগুণ করিলাম কেন না আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমানুষ নাই, আমি যদি একটু যত্ন না করি কে করিবে বল?”

বিন্দু। “উমা, তুমি যে এটুকু করিবে তাহা আমি জানিতাম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানিতাম, অন্যে তোমাকে দোষ দিয়াছে, আমি দোষ দি নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা, একটু যত্ন স্নেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্ত্তব্য, এ গুলি তুমি শিখিয়াছ, সকলে শিখে না। পূর্ব্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ মানুষ হইয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর ভয়ে, ননদের ভয়ে, জায়ের ভয়ে আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেকটা চাপা পড়িত, আমারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর আদেশে সংসার চলিত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকিতে শিখিয়াছে, ছেলেরা ও যাহা ইচ্ছা করে,

বৌয়েরাও আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, সংসার সুখ অনায়াসে বিনষ্ট হয়।"

উমা। বিন্দু দিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলেই একত্রে থাকিবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যাইতে পারিত না, মেয়েরাও নম্রতা শিখিত।"

বিন্দু। "উমা. সুখ দুঃখ সকল প্রথাতেই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করিবার কি এই সুখ?"

উমা। "কালীদিদির দুঃখের অন্য কারণ। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে চিরজীবনের প্রণয়সুখে বঞ্চিত।"

বিন্দু। "আমি প্রণয়সুখের কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রত্যহ পথের মুটের চেয়েও যে সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া যে, সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে নির্দোষে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও গঞ্জনা ও গালী খায় তাহার কারণ কি?"

উমা। "বিন্দু দিদি, সে কালীদিদির খুড়শাশুড়ীরা মন্দ লোক এই জন্য।"

বিন্দু। "তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হইবে, তাহারই সম্ভাবনা কি? একজন মন্দ হইলেই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন খিটি নাটি ও কোন্দল; যে কালীতারার মত ভাল মানুষ তাহারই অধিক যাতনা। এই সব দেখিয়াই যাদের একটু টাকা হয় তারা ভিন্ন থাকিতে চায় না হইলে আপনার লোক কে ইচ্ছা করে ত্যাগ করে বসে। তা ভিন্ন থাকিয়াও যদি আমাদের যার যেটুকু করা আবশ্যক তাহাই করি, শাশুড়ীর ভয়ে যেটুকু শিখিতাম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি, তাহা হইলেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে। এখনকার মেয়েরা এটী বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তায় জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফাটকে দাঁড়াইল। উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাক্ষের নিকট যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধনঞ্জয় বাবু বাগান হইতে আসিলেন। তাঁহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল,

তিনি নিজে অচেতন, দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

ঝর ঝর করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,

"উমা, ভগবান্ জানেন নারীর যতদূর কষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ্য করিতেছ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নাই. বোধ হয় রাত জাগিয়া, না খাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার এই দশা হইয়াছে, রোগও হইয়াছে। কি করিবে বন, যেটি সইতে হয় সহিয়া থাক। যত্নের ক্রটী করিও না, অভিমান দেখাইও না, একটী উচ্চ কথা কহিও না, তাহা হইলে আরও মন্দ হইবে, এ রোগের সে ঔষধি নহে। নীরবে এ যাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ পাইবে মিষ্ট কথায় ধনঞ্জয় বাবুকে তুষ্ট করিও, কথায় বা ইঙ্গিতে তিরস্কার করিও না, কাঁদিতে হয় গোপনে কাঁদিও। যাহাদের লইয়া ধনঞ্জয় বাবু এখন এত সুখ অনুভব করেন, হয়ত কাল তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন। পরম অসদাচারী ও অসদাচার পরিত্যাগ করিয়া আবার পবিত্র স্নিগ্ধ সংসার সুখ খুঁজিয়াছে এমনও আমি দেখিয়াছি। তোমার মাকে আমি অদ্যই চিঠি লিখিব, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, আশায় ভর করিয়া থাক,—প্রাণের উমা, ভগবান্ এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে পারেন, তোমাকে সুখ দিতে পারেন।"

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। উমা বিন্দুর কথার কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, ভগবান একটী সুখ আমাকে দিতে পারেন,—মৃত্যু।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আর একজন হতভাগিনী।

বিন্দু বাটী আসিয়া পালকী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল,

"অ দিদি, দিদি, কে এসেছে দেখবে এস।"

বিন্দু। "কে লো"

সুধা। "এই দেখবে এস না, এই শোবার ঘরে বসে আছে।"

বিন্দু। "কে শরৎ বাবু"

সুধা। "না শরৎ বাবু নয়। দিদি, শরৎ বাবু এখন আর আসেন না কেন?"

বিন্দু। "শরৎ বাবুর কি পড়া শুনা নেই, তার একজামিন কাছে, সে কি রোজ আসতে পারে?"

সুধা। "একজামিন কবে দিদি?"

বিন্দু। "এই শীতকালে।"

সুধা। "তার পর আসবেন?"

বিন্দু। "আসবে বৈকি বন, এখন ও আসবে, তা রোজ রোজ কি আসতে পারে, যে দিন অবকাশ পাইবে আসবে। উপরে কে বসিয়া আছে?"

সুধা। "কে বল না?"

বিন্দু। "চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন নাকি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর কে আসবে?"

সুধা। "না তিনি নয়।"

বিন্দু। "তবে বুঝি দেবী বাবুর স্ত্রী, এত দিন পর বুঝি একবার অনুগ্রহ করে পদ্ধূলি দিলেন"

সুধা। "না তিনিও নয়,—কালীদিদি আসিয়াছে।"

বিন্দু। "কালীতারা! তারা কলকেতায় এসেছে কৈ কিছুই ত জানিনি।"

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন; অনেক দিন পর তাহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন,

"এ কি, কালীতারা! কলকেতায় কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল আছ?"

কালী। "এই পাঁচ সাত দিন হোল এসেছি, এতদিন কাযের ঝন্‌ঝটে আসতে পারিনি, আজ একবার মেজখুড়ীকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া আসিলাম। ভাল নেই।"

বিন্দু। "কেন কাহার ব্যারাম সেয়রাম হয়েছে নাকি?"

কালী। "বাবুর বড় বেরাম' তাঁরই চিকিৎসার জন্য আমরা কলকেতায় এসেছি। বৰ্দ্ধমানে এত চিকিৎসা করাইলেন কিছুই হোল না, এখন কলকেতায় ইংরেজ ডাক্তার দেখ্‌চেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা।" এই বলিয়া কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। "সে কি? কি ব্যারাম?"

কালী। "জ্বর আর আমাসা। সে জ্বর ও ছাড়ে না, সে আমাসা ও বন্ধ হয় না, আহা তাঁর শরীরখানি যে কাঠিপানা হয়ে গিয়েছে" আবার চক্ষে বস্ত্র দিয়া কালীতারা ফোঁপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। "তা কাঁদ কেন বন, কাঁদলে আর কি হবে বল। এখন ভাল করে চিকিৎসা করাও ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। তা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন? পুরাণ জ্বর আর আমাশায় কবিরাজ যেমন চিকিৎসা করে, ইংরাজ ডাক্তারে তেমন কি পারে?"

কালী। "কবরেজ দেখাতে কি বাকি রেখেছে বিন্দু দিদি, কবরেজে হার মেনেছে তবে ইংরেজ ডাক্তাব ডেকেছে। বৰ্দ্ধমানে তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবরেজ দেখিয়াছে, কলকেতা থেকে ভাল ভাল কবরেজ গিয়াছিল, কিছু করতে পারিল না।"

বিন্দু। "ভবে দেখ বন, ইংরাজী চিকিৎসায় কি হয়। তোমরা আছ কোথায়?"

কালী। "কালীঘাটে একটী বাড়ী নিয়েছি, ঠিক আদিগঙ্গার কিনারায়।"

বিন্দু। "কালীঘাটে কেন? এই বর্ষাকালে কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম সেয়ারাম হচ্চে, সেখানে না থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় রইলে না কেন?"

কালী। "তাও কি হয় দিদি? ওরা কলকেতায় আসতে চান্ না, বলেন এখানে বাচ বিচার নেই, এখানে জাত থাকে না। শেষে কত করে কালীঘাটের একজন পাণ্ডাকে দিয়ে একটী বাড়ি ঠিক করিয়া তবে আমরা আসিলাম। রোজ আমাদের আদিগঙ্গায় স্নান হয়, রোজ পুজা দেওয়া হয়। কত ক্রিয়া কৰ্ম্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে, আমার

শাশুড়ীরা জোড়া মোষ মেনেছেন,—আমার কি আছে বিন্দু দিদি, আমার রূপার গোটটী বেচিয়া জোড়া পাঁঠা দিব মেনেছি। আহা ঠাকুর যদি রক্ষা করেন, বাবুকে যদি এ যাত্রা বাঁচান তবেই আমরা বাঁচলুম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল, ধন বল, বিষয় বল, খ্যাতি বল, কুলের গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব; তিনিই সকলের মাথা, তিনি একাই সব কচ্চেন কর্ম্মাচ্চেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্চেন। তিনি না থাকিলে আমাদের কে আছে বল, ভগবান! এ কাঙ্গালিকে চির-হতভাগিনী করিও না।”

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে জানিত না,—আজি সে স্বামী বিয়োগ চিন্তার যাতনায় ধুলায় লুণ্ঠিত হইল।

বিন্দু কালীকে অনেক কবিয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন “ভয় কি বন, চিকিৎসা হইতেছে তবে আর ভয় কি? আমাদের বাবু আছেন, তোমার ভাই শরৎ বাবু আছেন, সকলে দেখিবে শুনিবে, পীড়া শীঘ্র আরাম হইবে। এই সুধার এমন ব্যারাম হয়েছিল, শরৎ বাবু কত যত্ন করলেন, দিন রত্রি খাওয়া ঘুম ছেড়ে সেবা করলেন, তাই বাঁচন, না হলে কি সুধা বাঁচত।”

কালী। বিন্দু দিদি, শরৎ রোজ এখানে আসে?”

বিন্দু। আগে আসত বন, এখন তার একজামিন কাছে, তাই আসতে পারে না; বাবুই বুঝি তাঁকে একটু ভাল করে লেখাপড়া করতে বলেছেন; প্রায় এক মাস অবধি আসেন নাই।”

কালী। “বিন্দুদিদি মধ্যে মধ্যে তাকে আসতে বলিও, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প সল্প করেলে থাকবে ভাল, আহা দিন রাত পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে গেছে, চক্ষু বসে গিয়েছে। কাল সে এসে ছিল, হঠাৎ চেনা যায় না।”

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ তা ত আমরা কিছু জানি নি। এখানে যখন আসত তখন বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে গেছে? এমন করেও পড়ে? না হয় একজামিন নাই হোল, তা বলে কি পোড়ে পোড়ে

ব্যারাম কর্‌বে? আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎ বাবুকে একদিন ডেকে আনবেন, মধ্যে মধ্যে শনিবার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকলেন”

তাহার পর উমাতারার কথা হইল; বিন্দু যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও খানিক কাঁদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,

“আমি আজই জেঠাইমাকে চিঠি লিখিব, জেঠাইমা আসুন যাহা করিবার করুন, আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পারি না। কলিকাতা ছাড়িতে পারিলে বাঁচি, আবার তালপুখুরে যাইতে পারিলে বাঁচি।”

কালী। “তোমাদের এই ভাদ্র মাসে যাবার কথা ছিল না? ভাদ্র মাস ত প্রায় শেষ হোল।”

বিন্দু। “কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠলো কই? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারি নি। পূজার পর না হলে আমাদের যাওয়া হচ্চে না, পূজারও বড় দেরি নাই, মাস খানেক ও নাই।”

কালী। “তবে তোমাদের ধান টান দেখবে কে?”

বিন্দু। “বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিয়ে এসেছেন। সোনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ করিয়া রাখবে, তার কোনও ভাবনা নেই।”

আর কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কালীতারা চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। উমাতারা কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন, এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। “এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দ্দশা, ওদিকে কালীতারার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার তুমি বল্‌চ শরৎও নাকি ছেলে মানুষের মত শরীরের যত্ন না নিয়া পড়াশুনা করিতেছে। এখন কোন দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে তুমিই মন্ত্রী, ইহার উপায় কি ঠিক করিয়াছ?”

বিন্দু। “ললাটের লিখন রাজার সৈন্যেও ফিরায় না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায়ও ফিরায় না। তবে আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিব।”

হেম। “তবু কি ঠিক করিলে? উমাকে কি বলিয়া আসিলে?”

বিন্দু। "কি আর বলিব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তাই দিয়া আসিলাম, এখনকার চঞ্চলমতি স্বামীকে বশ করিবার যে মন্ত্রটী জানি, তাহাই শিখাইয়া আসিলাম।"

হেম। "সে ভীষণ মন্ত্রটী কি, আমি জানিতে পারি কি?"

বিন্দু। "জানবে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটী আঁবগাছ আছে; তাহারই ডাল লইয়া প্রকাণ্ড একটী মুগুর প্রস্তুত করিয়া বিপথগামী স্বামীকে তদ্দ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহা মন্ত্র!"

হেম। "না বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নহে।"

বিন্দু। "তবে কিরূপ?"

হেম। "কচি আঁবের অম্বল রাঁধিয়া দেওয়া, পাকা আঁবের সুমিষ্ট রস করিয়া দেওয়াই বৃহস্পতির মন্ত্রের কয়েকটী সাধন দেখিয়াছি, আর বেশি বড় জানি না।"

বিন্দু। "তবে তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছি। আর জেঠাইমাকে পত্র লিখিব, তিনি আসিলে বোধ হয়, উমার মনও একটু ভাল হইবে, ধনঞ্জয় বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাকিবেন।"

হেম। "জেঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসিবেন কেন?"

বিন্দু। "আমি সব কথা লিখিলে আসিবেন। হাজার হোক মার মন।"

হেম। "আর কালীতারার কি উপায় করিলে?"

বিন্দু। "সেটী তোমাকে দেখিতে হবে। তোমার চাকুরি টাকুরি ত বিলক্ষণ হল, এখন প্রত্যহ একবার করে কালীঘাটে গিয়া রোগীর যত্ন করিতে হবে। সে বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ একজনও নেই, হয়ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদগুলা খাওয়াইয়া রোগীর রোগ আরও উৎকট করিবে। চিকিৎসাটি যাতে ভাল করিয়া হয়, তুমি দেখিও।"

হেম। "তা আমার যাহা সাধ্য করিব। কাল প্রত্যুষেই সেখানে যাইব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করিলে? তুমি রইলে একদিকে আমি রইলাম আর একদিকে, শরৎ বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?"

বিন্দু। "তাই ত, সে পাগলা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। গুলো

সুধা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন টত্ন করতে পারবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হোলো।”

সুধা দূরে খেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল “দিদি ডাকছিলে?”

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “হেঁ ব’ন ডাক্‌ছিলুম। বলি তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন করিতে পারবি?”

বালিকার কণ্ঠ হইতে ললাট প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয় পূজা।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের বড় আমোদ। নূতন কাপড় হবে, নূতন জুতা হবে, নূতন পোষাক বা টুপি হবে, ইস্কুলের ছুটি হবে, পূজার সময় যাত্রা হবে, ভাসানের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যাবে। বালকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেয়ানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাসকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন খারাব হইয়াছিল, বলিয়া তাহা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ি আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্ণে ছাদে পা মেলাইয়া বসিয়া বুদ্ধিমতী পড়ষী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন “এবার দেখিব, বেয়ান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাথি মেরে ফেলে দিব। বের সময় বড় ফাকি দিয়েছে, এবার দেখব কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কলকেতায় কটা

আছে? মিন্‌সের যেমন বাওত্তুরে ধরেছে এমন ছেলেরও এমন ঘরে বে দেয়! তা দেখ্‌বো. দেখ্‌বো, তত্ত্বের সময় কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইব, নৈলে আমি কায়েতের মেয়ে নই।" রোরুদ্যমানা বালবধূ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য তিন মাস হইতে বৃথা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটী না দেখিয়া মেয়ে পাঠাবেন না।

সামান্য ঘরের যুবতীগণও দিন গুনিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকুরি করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটী পাইয়া একবার ভার্য্যার মুখ দর্শন করেন। "এবার কি তিনি আসিবেন? সাহেবে কি এবার ছুটী দিবেন? হেগা সাহেবদের কি একটু দয়া মমতা নেই, তাঁদেরও কি স্ত্রী পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না?

বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচ গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়োজন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কায কি?

পল্লিগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অনুগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাদ্র মাসে শস্য কাটিয়া জমীদারের খাজনা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষক বধূগণ লুকিয়া চুবিয়া সেই ধান একটু সরাইয়া হাতের দুগাছি সাঁকা করিতেছে, বা হাটে একখানি নূতন কাপড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বঙ্গদেশ যেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিৎবর্ণ বেশ ধারণ করিলেন; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরতের আহ্লাদকর জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে লাগিলেন বায়ু নির্ম্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মনুষ্য শরীরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘর ও ধন ধান্যে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পূর্ণ হইল, চালে নূতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয় পূজার যে এত ধুমধাম, তাহার এই কারণ,—অন্য কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময়ী শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নয়। দরিদ্রের দুঃখ অপনীত হয় কিন্তু শোকার্ত্তের শোক অপনীত হয় না। উমাতারার

মাতা কলিকাতায় আসিলেন, বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয় বাবু দিন কতক একটু অপ্রতিভের ন্যায় বোধ করিলেন, কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপনীত হইল না, তিনি বাড়ী-ভিতর আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পল্লিগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিতে দেখিতে সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। হতভাগিনী উমা আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল, বর্ষাশেষে তাহার কাশি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখ খানি অতিশয় রুক্ষ, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট। কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা না কহিয়া দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকার্য্য করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা সুশ্রূষা করিত, স্বামীর জন্য নানারূপ ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালীতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না, সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে যে টুকু ভাল হয় একদিন অনিয়মে সে টুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবেন কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না কেবল প্রত্যহ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাধিয়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা যত্ন সহকারে মিশ্রির পাণা প্রস্তুত করিত, আক পেঁপে ছাড়াইয়া দিত, মুগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজ হস্তে রেকাবি সাজাইয়া ঝিয়ের দ্বারা শরতের বাটীতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক মানা করিয়া পাঠাইত, কিন্তু ছেলেটী কিছু পেটুক, সেই মুগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ হইলে সে মিশ্রির পানা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইত। ঝিকে বলিতেন "ঝি, কাল থেকে আর

এনো না, তাঁরা কেন রোজ রোজ কষ্ট করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি সত্য বলিতেছি, আমার এসব দরকার নেই।" ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া "তা দেখিতেই পাইতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে পেটুক বালকের কথায় মানা করা না শুনিয়া সুধা প্রত্যহ মিস্রির পানা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী বাবুর বাড়ীতে বড় ধূম ধাম, দেবীর বৃহৎ মূর্ত্তি, অনেক গাওনা বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা। দেবী বাবুর গৃহিণীর বুকের বেদনা টা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারাণ্ডায় চিক ফেলিয়া ঠায় বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিরাজ গৃহিণীর মৎলব বুঝিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হেঁ তাহাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি সেটা যেন ভাল করিয়া মালিস করা হয়।"

দেবী বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীও আসিয়া যাত্রা শুনিল। নিতান্ত অনভিলাষও নাই। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা, রাধিকার মান ভঞ্জন, গান গুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থই কত প্রকার; গৃহিনীগণ রোরুদ্যমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে থাবড়া মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদগদ চিত্তে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া গিয়া যাত্রা শুনে এলেন। সকালে এসে হেমকে বলিলেন,

"মান ভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।

হেম "না মান ভঞ্জন প্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, আর যাত্রায় কি দেখিব?

বিন্দু স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,

"মিথ্যা কথাগুলো আর বোলো না, পাপ হবে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমী।

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাদ্য ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ইতর কি ভদ্র, কি শিশু কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের ন্যায় গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্রও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অদ্য এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুব সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিল। বোধ হইল যেন জগতে আজি বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা কবিল, অপবাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মনুষ্য হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অদ্য বাঙ্গালির হৃদয়ে উথলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহবী, সৌজন্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রবঞ্চনার বিষয়, দেখিয়াছি,—নিষ্ঠুর লেখনীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য এই পুণ্য রজনীতে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এই সুখ লহরী দেখিলাম, হৃদয় তুষ্ট হইল, শরীর পুলকিত হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা থাকে, কোনও পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার উপর যবনিকা পাতিত কর,—সেগুলি আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রান্নাঘরে ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুটী ঘুমাইয়াছে, সুধা ঘুমাইয়াছে, হেমবাবুও শুইয়াছেন, ঝিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর দরজায় খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন, ও উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময় কবাটে একটী শব্দ শুনিলেন, কে যেন আস্তে আস্তে ঘা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ হইল।

"কে গা? দরজায় কে দাঁড়িয়ে গা?" কোনও উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন? হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লোকটীকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, পর মুহূর্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট, কিন্তু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও অতিশয় গম্ভীর, শরীরখানি শীর্ণ হইয়াছে, একখানি ময়লা একলাই মাত্র উত্তরীয়!

উভয়ে ভিতরে আসিলেন,—শরৎ বলিলেন,

বিন্দুদিদি অনেক দিন আসিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না, আজ বিজয়ার দিন প্রণাম করিতে আসিলাম।

বিন্দু। শরৎ বাবু বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও, তোমার বে থা হউক, সুখে সংসার কর, এইটী যেন চক্ষে দেখিয়া যাই। ভাইকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব।

বিন্দুর স্নেহ-গর্ভ বচনে শরতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পরে বলিলেন,

শরৎবাবু, তুমি অনেক দিন এখানে আইস নাই, তাহাতে এসে যায় না, প্রত্যহ তোমার খবর পাইতাম, জানিতাম আমাদের কোনও বিপদ আপদ হইলে তুমি আসিবে। কিন্তু এমন করে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া আগে না শরীর আগে? আহা তোমার চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, শরীর জীর্ণ হইয়াছে, এমন করে কি দিন রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে কি বুঝাইতে হয়, তোমার

বিন্দুদিদির কথাটী রাখিও, রাত্রিতে ভাল করে ঘুমিও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার মত ছেলে পরীক্ষায় অবশ্য উত্তীর্ণ হইবে।”

শরতের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “বিন্দুদিদি, পরীক্ষা দিতে পারিলে কি জীবনের সুখবৃদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড় দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে কয়জন আছে?”

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্য এত চিন্তা কেন? শরীর মাটি করিতেছ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্য এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুইহাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এ কি শরৎ বাবু! কাঁদ্‌চ কেন? ছি তোমার কোনও কষ্ট হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বলচো না কেন? শরৎ বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন্ কথাটি আমাকে বল নাই, আমি কোন কথাটী তোমার কাছে লুকাইয়াছি। এত দিনের স্নেহ কি আজ ভুলিলে, তোমার বিন্দুদিদিকে কি পর মনে করিলে?

শরৎ। বিন্দুদিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করিব সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেহ থাকিবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকটে লুকাইব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, বিন্দু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সংকোচ করিও না।”

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, বিন্দুদিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ চিন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। বন্ধুর গৃহে আসিয়া আমি অসদাচরণ করিয়াছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করিয়াছি। বিন্দুদিদি আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার হৃদয় ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত!

শরৎ বিন্দুর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে বিন্দুর সেই দুর্ব্বল কোমল বাহু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অগ্নি কণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শ চরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোনও পাপ চিন্তা ধারণ করে? তাহা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অদ্য এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর মনে একটু ভয় হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,

শরৎ বাবু, তোমাকে বাল্যকাল হইতে আমি ভাই বলিয়া জানি, তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে; দিদির কাছে ভ্রাতা যাহা বলিতে পারে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা বল।

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করিয়াছি, যে পাপ চিন্তা মনে ধারণ করিয়াছি, তাহা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোষে বলিলেন, তবে আমার কাছে সে কথা বলিবার আবশ্যক নাই, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ভগিনীকে সম্মান করিও।

শরৎ বিন্দুর বাহুদয় ছাড়িয়াদিলেন, আপন মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর ন্যায় যাহার নির্ম্মল আচরণ, শিশুর ন্যায় যে পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপ চিন্তা ধারণ করিতে পারে? ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছিয়া দিলেন, পর আস্তে আস্তে বলিলেন,

শরৎ; তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠিতে পারে না, যাহা আমার শুনিবার অযোগ্য। তোমার যাহা বলিবার বল, আমি শুনিতেছি।"

শরৎ, জগদীশ্বর তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে সুখী করুন। বিন্দু দিদি, আর একটী অভয়দান কর, যদি আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর তুমি এ কথাটীকাহাকেও বলিবে না। আমার পাপ চিন্তা, আমার

জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হইবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।"

বিন্দু। তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।

শরৎ তখন মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ যেন স্থগিদ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া, অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "পুণ্য-হৃদয়া, সরলা বিধবা সুধার সহিত আমার বিবাহ দাও।" বিন্দু তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছয় মাসের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরৎ তখন ক্লিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল, "বিন্দু দিদি, আমি মহাপাপী। ছয়মাস হইল, যে দিন সুধাকে তালপুখুরে দেখিলাম সেই দিন আমার মন বিচলিত হইল। পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানিতাম না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানিতাম না, সে দিন সেই সরলহৃদয়া স্বর্গের লাবণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখিয়া আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করিলাম। কালে সেটী তিরোহিত হইবে আশা করিয়াছিলাম কিন্তু দিন দিন কলিকাতায় অধিক বিষ পান করিতে লাগিলাম, আমার শরীর, মন, আত্মা, জর্জ্জরিত হইল। বিন্দুদিদি তুমি সরল হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটীতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আমাকে আসিতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করিয়া, পাপ চিন্তা ধারণ করিয়া, দিনে দিনে এই পবিত্র সংসারে আসিতাম। জগদীশ্বর এ মহা পাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করিবেন? বিন্দুদিদি তুমি কি ক্ষমা করিবে? সুধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতাম, অনেকক্ষণ বসিয়া দুই জনে গল্প করিতাম, অথবা আকাশের তারা গণিতাম, তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কি পাপ চিন্তা করিতাম বিন্দুদিদি তোমাকে কি বলিব। আমার বিবাহ হইবে, একটী সংসার হইবে লাবণ্যময়ী সুধা সে সংসারে রাজ্ঞী হইবে, আমার জীবন সুধাময় করিবে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করিত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করিতাম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ করিতাম। প্রত্যহ আসিতে আসিতে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য

হইলাম, তখন হেম বাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া একদিন কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান আসিল, পাঠ, পুস্তক, পরীক্ষা চিতার আগুনে দগ্ধ হউক,—কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়িয়াছি, পাছে সরলচিত্তা সুধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হইল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ করিলাম। সুধাকে না দেখিয়া আমিও তাহার চিন্তা ভুলিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু সে বৃথা আশা! বিন্দুদিদি সে পাপচিন্তা ভুলিবার জন্য আমি দুই মাস অবধি প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা, নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টার ন্যায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, নাট্যশালায় যাইয়া সে চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার সহপাঠীদিগের সহিত মিশিয়াছি, গীত বাদ্য শুনিতে গিয়াছি, কিন্তু সে কাল চিন্তা ভুলিতে পারি নাই। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার নাট্যাভিনয়ে সেই আনন্দময় মুখমণ্ডল দেখিতাম,—রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতাম। বিন্দুদিদি এ দুই মাসের কথা আর বলিব না, পথের কাঙ্গালীও আমা অপেক্ষা সুখী।

"বিন্দুদিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বলিলাম, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমাকে মহাপাপী বলিয়া দূর করিয়া দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘৃণা করিলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করিবে, কে আমাকে স্থান দিবে?" আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়নবারি বহিতে লাগিল।

বিন্দু স্থির হইয়া এই কথা গুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,

ছি শরৎ বাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে ধিক্কার করিও না। তোমাকে ছেলে বেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করিতে পারি? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নাই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলিয়া ধিক্কার করিতেছ। তবে বিধবার বিবাহ

আমাদের সমাজে চলন নেই, তা এখন বিবাহ হয় কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, যাহা হয় তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তা তুমি আপনাকে এরূপে ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথায় বাবুর যাহাই মত হউক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হইবে না।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করিলে, আমাকে যে আজ ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না।

বিন্দু। "শরৎ বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই, কিছু খাবে? একটু মুখটুক ধোও না, বাবুর জন্য আজ লুচি করেছিলুম। তার খানকত আছে। একটী সন্দেশ দিয়ে খাবে"?

শরৎ। "না দিদি আজ কিছু খাইব না, খাদ্যে আমার রুচি নাই।"

বিন্দু। "তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিও।"

শরৎ। "ক্ষমাকর, এ বিষয়ে হেম বাবু যাহা বলেন, আমাকে বলিও, তাহার পূর্ব্বে আমি হেম বাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না"।

বিন্দু। "তা কাল না আসিলে নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অসুখ করিবে যে।"

শরৎ। "দিদি ক্ষমা কর, এ বিষয় নিষ্পত্তি না হইলে আমি সুধার কাছে মুখ দেখাইব না। দেখিও বিন্দু দিদি, এ কথা যেন সুধার কাণে না উঠে, তাহার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে এক জন হতভাগা থাকিবে, আর একজনকে হতভাগিনী করিবার আবশ্যক নাই।"

বিন্দু। "তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয় তাহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।"

শরৎ। "না দিদি, পত্রে এ কথা লিখিও না, আমি আপনি আসিয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কবে আসিব বল, আমার জীবনে বিধাতা সুখ লিখিয়াছেন কি দুঃখ লিখিয়াছেন কবে জানিব বল।"

বিন্দু। "শরৎ বাবু, এ কথা ত দুই একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, অনেক দিক

দেখিতে হবে, অনেক পরামর্শ করিতে হবে। তা তুমি দিন ১৫। ২০ পরে এস।"

শরৎ। "তাহাই হউক। আমি কালীপূজার রাত্রিতে আবার আসিব, এ কয়েক দিন জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।"

কৃষ্ণচরিত্র।

একক্ষণে উদ্যোগ পর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক—

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজের একটী মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মত এই:—যে দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটী মত এই যে অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটী পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটী মতই যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটীর মধ্যে একটী যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটী অতিকঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম বলে সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাঁহাদিগের রাজনীতি বলে সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগ পর্ব্ব মধ্যে প্রধান তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার মীমাংসক. প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগ-পর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে রূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন. তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন ; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক সময় ঘটে যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযুজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে, যে আইন আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই, যে যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায় ; যে দুর্ব্বল সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান অথচ ক্ষমাবান, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি পাঠকেরা সকলেই জানেন, যে পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন ; তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন ; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের

নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয় তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিরাট রাজের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইয়া তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না, যে যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেননা হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত একটী গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না— বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ বিধ্বংশের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে

রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, যে সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও "parliamentary procedure" ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহা বলবান বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যে টুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদ ও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে, এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন, যে দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন, যে যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, "তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম, যে তিনি কৌরবপাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাত শূন্য উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুইজনে একদিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তক সমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিয়া-

মাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।" .

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সম যোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমর পরাঙমুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙমুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগ পর্ব্বে এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টী কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিবার সময়ে—একটা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা চাই—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিয়াই কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল

কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে॥

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে।) যেখানে মহাভারত একটি ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই; তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথা গুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই, যে তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

এখনও ইহা স্বীকার করা যাউক, যে ঐ সকল ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যে টুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাস গ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সে

সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্ত্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপি বিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্ব প্রথানুসারে গুরু শিষ্য পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই, যে রোম গ্রীশ বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাস গ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ, বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনাপ্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখন ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহাদিগের রচনা লোক মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোক হিত

সাধন করে, তাঁহারা সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তবে, অবশ্য এমন কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যে গ্রন্থে কিছু সত্য আর অনেক মিথ্যা আছে, তাহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্যা তাহা কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে। সে বিচার পশ্চাৎ করা যাইতেছে।

ইউরোপিয়েরা মহাভারতকে "Epic Poem" বলিয়া থাকেন, দেখাদেখি এখনকার নব্য দেশীয়েরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সব উড়িয়া গেল। মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ; উহাতে আর কোন ঐতিহাসিকতা থাকিল না। এ কথারও বিচার করা যাউক।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমন হইতে পারে না, কেন না সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয় যে প্রকার সৌন্দর্য্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে এপিক বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও থ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্টীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই;

মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। তাহা স্থানান্তরে বুঝান গিয়াছে।

স্থূলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস মূলতঃ যে ঐতিহাসিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই; এবং নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এমনও বিবেচনা হয় না।

যদি মহাভারতের কোন অংশের ঐতিহাসিকতা থাকে তবে কৃষ্ণেরও ঐতিহাসিকতা আছে।

মহাভারতের কোন অংশ অনৈতিহাসিক, বা প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে? তাহা আমরা সময়ে সময়ে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে পাঠকের বিচার সাহায্যের জন্য একত্রিত করিয়া দিতেছি।

(১) যাহা অনৈতিহাসিক, স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া ত্যাগ করাই উচিত।

(২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণই পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৩। সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না তাহার অভাবে মহাভারতের মহাভারতত্ব থাকে না। দেখা যায়, যে সে গুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায়, যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৪) মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্র গুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি

কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। যদি মনে কর কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে স্থান বিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

(৫) যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত চারিটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচন বিচার প্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

কো তুঁহু!

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহিঁ আসন,
অরুণ-নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়,
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল,
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল
চরণ কমলযুগ ছোঁয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখ পর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই,
পদতলে আপনা খোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছই,
অনুখণ সঘন নয়ন জল মুছই,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ পর গোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

———

আর আধখানা কোথায় ?

এই পৃথিবীতে আসিয়া যেন কি হারাইয়াছি, সদাই যেন সেই হারাণ ধনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি কিন্তু কি যে হারাইয়াছি আর কাহাকেই বা খুঁজিতেছি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। মনের এই ব্যাকুলতা ঘুচাইবার জন্য—অন্তরের শান্তি লাভের জন্য সংসার সাগরে কতই ডুব দিতেছি কিন্তু অন্তরের সেই জ্বালা কিছুতেই থামে না। এক একবার কাতরভাবে রোদন করি কিন্তু যাহাকে ডাকিতেছি আমার কান্না তাহার কাছে পৌঁছে না। আমি কাহার জন্য বা কিসের জন্য এত ব্যাকুল তোমরা কেহ বুঝাইয়া দিতে পার ?

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী একদিন বলিয়াছেন যে এ জগতে তিনি একা, জগতের কোন পদার্থে তিনি তাঁহার মন বাঁধেন নাই—তাই তাঁহার মন সদাই উড়িয়া যায়, তাই তিনি কখন সুখী হন নাই ; তাঁর কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এক জায়গায় মন বাঁধিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যাহা খুঁজি পাইব, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না ; আমিও জোর করে মনের স্বাধীনতা হরণ করতে বড় রাজি নহি। মন যখন পার্থিব কোন পদার্থেই বাঁধা থাকিতে চায় না, তবে আমার মন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় এই একটি আমার প্রধান ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে তিনি একা, আমি ভাবি আমি একা নই। আমি আধখানা। আমার একটা আদৎ দেহ আছে বটে, কিন্তু মনটা আমার আধখানা। এই জগতে আমার মনের অপরার্দ্ধ কোথাও না কোথাও আছে ; আমার এই আধখানা মন অপর আধখানা মনের সহিত মিশিতে চায়, যত দিন না এই দুই আধখানায় মিশিয়া পূরা হইবে ততদিন অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুচিবে না। আমার অসম্পূর্ণ মন পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি উহাকে রূপরসাদি পার্থিব বিষয়ে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তবে সে বাঁধনে মন ত কখনই সন্তুষ্ট হইবে না ; আমি

আর আমার মনকে কোথাও বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। যাও মন তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যেখানে তোমার অভিমত পদার্থ আছে তুমি সেইখানে চলিয়া যাও, একবার খুঁজিয়া বলিয়া দাও দেখি, সেই অপরার্দ্ধ কোথায় এবং কি ভাবে থাকে—একবার তাহাকে চিনাইয়া দাও ; আর আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই চাহিব না। আমার মন, মন চায় ; অন্য পদার্থে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও বাঁধা থাকিতে চায় না। মনের স্রোত মনের সমুদ্রে মিশিতে চায়, আমার ভিতরকার মন, বাহিরে মনের সহিত মিশিতে চায়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে তাহাদের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাই আমার ভিতরে এত গোলমাল, এত কলকল নাদ। আমি এত দিন না বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম এইবার হইতে মনের পক্ষ অবলম্বন করিব মনস্থ করিলাম।

আমার ভিতরকার মন আধখানা, বাহিরে উহার অপরার্দ্ধ রহিয়াছে, তাই তাহার সহিত মিশিবার জন্য সদাই বাহিরে আসিতে চায়। কিন্তু একটি বড় গোল উপস্থিত হইয়াছে। যাহা অসম্পূর্ণ তাহাই কুৎসিৎ ; যাহা কুৎসিৎ তাহাকে আমার বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে বড়ই সংকোচ হয়। সেই জন্য যদি বা কখন মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মনকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাই, তখন উহাতে এমনি একটি আবরণ দিয়া বাহির করিতে যাই যে লোকে উহাকে কুৎসিৎ বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করে। এই লোকলজ্জার খাতিরে পড়িয়া, পরনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া, আমার আধখানা মনকে যথাবৎ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার বাহিরের মন, ভিতরকার মনের ঐ আবরণে ঠেকিয়া ভিতরকার মনের সহিত মিশিতে পারিল না, আমিও অন্তরের শান্তি কখন পাইলাম না।

তোমাদের পৃথিবীতে সত্যের আদর নাই, তাই তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমার বড় বনে না। আমি যদি আমার ভিতরকার মনকে উলঙ্গ অবস্থায় বাহিরে প্রকাশ করিতে যাই তবেই আমি তোমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব ; তোমরা আমাকে হয়ত মনুষ্যসমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে—তোমরা সত্যের আদর জান না, তাই আমি সত্যাচারী হইতে পারি নাই। তোমরা সকলেই কপটাচারী হইয়া আমাকেও কপটাচারী করিয়াছ। সেই

জন্যই আমার ভিতরকার মন আমার বাহিরের মনের সহিত মিশিতে পারিতেছে না—তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইতেছে না। হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মোচন করিয়া অন্তরের ভাব যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া সত্যের সহায় লইয়া পূর্ণ হইবে, এই অভিলাষটি বড়ই প্রবল হইয়াছে—কিন্তু আমার এ অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? সত্যের আদর জানে এমন লোক কি তোমাদের পৃথিবীতে কেহই নাই? অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ, এর মধ্যে যতদিন আবরণ রাখিবে ততদিন শান্তি মিলিবে না। যাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে এই আবরণটি ঘুচিয়া যায় তাঁহাকেই আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝি। যিনি সত্যের উপাসক তাঁহাকেই আমি কৃষ্ণোপাসক বলিয়া বুঝি। গোপীগণের বস্ত্র হরণে যিনি মন্দরুচি দেখেন দেখুন, কিন্তু আমি উহার ভিতর একটি বড় সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। অন্তরকে আবরণ শূন্য না করিলে কৃষ্ণের সহিত মিশা যায় না।

যতদিন আমার ভিতরের এই আধখানা মন বাহিরের অপরার্দ্ধের সহিত না মিশিবে তত দিন আমি অসম্পূর্ণ, তত দিন আমি কুৎসিৎ, তত দিন আমি সকাম; আমার এই সকাম মনকে যিনি নিষ্কাম করিতে সক্ষম তিনিই আমার হৃদয়ের সখা—তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথায় তোমরা কি অর্থ বুঝ আমি জানি না, কিন্তু আমি এই মাত্র বুঝি যে যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের গুরু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ; যিনি সত্যের পক্ষপাতী, সত্যাবলম্বী ঘোর পাপীও যাঁহার ভালবাসার পাত্র, যাঁহার কাছে সত্যই ধর্ম্ম, লোকনিন্দা লোক লজ্জায় যিনি কখন ব্যথিত নহেন, আমার মন হাজার কুৎসিৎ হইলেও যিনি আমার উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহাকে আমি অকাতরে আমার উলঙ্গ মন সমর্পণ করিতে পারি এবং যিনি আমার সেই মন লইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারেন তিনিই আমার হৃদয়-বন্ধু। কোথায়—আমার সেই হৃদয়-বন্ধু কোথায়!

দেশীয়

নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি।

আজিকার দিনে, এ দেশে যত কথার আন্দোলন হইতে পারে, তন্মধ্যে সামাজিক স্থিতি ও গতিই সকলের অপেক্ষা গুরুতর। আর সকল তত্ত্বই ইহার অন্তর্গত। বড় আহ্লাদের বিষয়, যে এই সম্বন্ধে দুই জন মহাত্মা প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ, এই সময়ে কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বপর্য্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালায়, আর একটি ইংরেজিতে। একটির প্রণেতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন অধিনায়ক, দ্বিতীয় লেখক এদেশে পজিটিবিজ্‌মের নেতা। উভয়েই উদার, মহদাশয়, পণ্ডিত, চিন্তাশীল, এবং ভারতবৎসল। আমরা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি" বিষয়ক প্রবন্ধ, * ও কটন্ সাহেব প্রণীত "New India," নামক নব প্রচারিত পুস্তকের কথা বলিতেছি।

নব্য বঙ্গ সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কেন না প্রয়োজন নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। স্থিতি ও গতিটা † সকলেরই বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

স্থিতি ও গতির পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা দ্বিজেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত কয়টি কথায় অতি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"গতি কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই; প্রত্যহই লোকেরা তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়-ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবসান করে, কাহারো শরীরে অধিক বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখন সমস্তই উল্‌টিয়া যায়; পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে; পূর্ব্বে জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে; এককালে আর এককালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীতকাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস-গুণে শীত-বস্ত্র

---

* তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র। | † Order and Progress.

পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এত কাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সমাজের ও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একরত্তি নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্ম কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ও গ্রীষ্ম কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীত কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোন কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না— সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি *যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে এ কথা শীতকালে খাটে না;* কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালে তেমনি খাটে, কোন কালে এ কথা উল্‌টাইতে পারে না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম। শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটী যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ব্বকালিক নিয়ম,— স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে—এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজে যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্ব সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্তি-মূল।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝাইয়াছেন, যে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ব্যতীত মঙ্গল নাই। স্থিতির দৃঢ়ভিত্তি-ভিন্ন সমাজের ধ্বংস হইবে; পক্ষান্তরে গতি ভিন্ন সমাজ নির্জীব হইয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেব উভয়েই বুঝাইয়াছেন যে আমাদের হিন্দু-সমাজের স্থিতির মূল বড় দৃঢ়, চারি হাজার বৎসরের ঝড় বাতাসে ইহার

একটি ডাল পালাও ভাঙ্গে নাই। তবে এ সমাজের গতি ছিল না। অবরুদ্ধ-স্রোতঃ জলাশয়ের মত, ইহা পঙ্কিল, শৈবালসঙ্কুল, মলিন এবং অপুণ্য হইয়া উঠিয়াছিল ময়লা মাটি জমিয়া ভরাট হইবার মত হইয়াছিল। তার পর উপরোক্ত দুই জন লেখকই বলিতেছেন, যে এখন সমাজে আবার গতি সঞ্চার হইয়াছে। আর উভয় লেখকের মত, যে সমাজের সেই গতি ইংরেজি শিক্ষা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয় লেখকের মতভেদ নাই। এবং এ সকল মতের যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তার পর একটা বড় গুরুতর কথা আছে।

গতি যেমন সমাজের মঙ্গলকর, ইহার অবিহিত বেগ তেমনি অনিষ্টকর। গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়; বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে। সমাজের ঐ রূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোন নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছু কাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে; প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়; প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভূত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের সহিত নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই দিনের পুরাতন নাবালক স্থিতিকে

বৎসর কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

"নব্য বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে বোধ করিবেন, উভয়ের মধ্য পথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতি মঞ্চে লইয়া যাইতে হইবে।"

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন "Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder."

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি? গতির বিষযে, কি দ্বিজেন্দ্র বাবু, কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই। আমাদেরও কাহারও কোন সন্দেহ নাই—হইবারও কোন সন্দেহ নাই। তবে কটন সাহেব এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয়, যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী। অতএব স্থিতির দিগে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপায়ে সেই স্থিতির বল অবিচলিত থাকে উভয় লেখকই তাহার এক একটা উত্তর দিয়াছেন। এইখানে দুইজন লেখকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আদি ব্রহ্মসমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর। তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। কিন্তু এই মতভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয়, বস্তুতঃ তত গুরুতর নহে। কেন না আদি ব্রহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম-মূলক; তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ততঃ "Historical continuity," রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The old Hindoo polytheism is a present basis of moral order and rests upon foundations so plastic that it can be moulded into the most diverse forms adapting itself equally to the intellect of the subtle metaphysicican and to the emotions of the unlettered peasant. It combines in itself all the elements

of intensity, regularity and permanence. Its chief attribute is stability. The system of caste, far from being the source of all the troubles which can be traced in Hindoo society, has rendered the most important services in the past and still continues to sustain order and solidarity. The admirable order of Hinduism is too valuable to be rashly sacrificed before any Moloch of progress. Better is order without progress, if that were possible, than progress with disorder. Hindooism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life. In the future its distinctive conceptions will be preserved and incorporated into a higher faith, but at present we are utterly incapable of replacing it by a religion which shall at once reflect the national life and be competent to form a nucleus round which the love and reverence of its votaries may cluster."

কটন সাহেবের বিশেষ ভরসা "নব্য হিন্দু" সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহার বাক্য পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The vast majority of Hindoo thinkers have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism which seeks only to decry the social monuments raised in ancient times by Brahmin theocrats and legislators, to vilify the past inorder to glorify the present, and to sing the shallow glories of an immature civilisation with praises never accorded to the greatest triumphs of Humanity in the past. The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilisation to shatter. The stability of the Hindoo character could have shown itself in no way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis."

নব্য হিন্দু ধর্ম্মের তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য নহে। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে তাহার ভিতর সত্য আছে। সে বর্ণনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The Hindu mind naturally runs in a religious groove of thought and recoils from any solution of its present difficulties which does not arise from the past religious history of the nation. And, therefore the vast majority of Hindoo thinkers do not venture to reject the supernatural from their belief. They adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these rights are embedded in the traditions and customs of the people, that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is thus animated by a spirit of large-hearted tolerance."

দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেবের এই সকল কথা সমালোচনা করিয়া যে কয়টি কথা পাওয়া গেল, তাহা পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এজন্য তাহা পুনরুক্ত করিতেছি।

স্থিতি এবং গতি এই দুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে। স্থিতি গতি-রোধকারিণী হইতে পারে; গতি স্থিতি-ধ্বংসিনী হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হইয়া, পরস্পরের সামঞ্জস্য হয়, সমাজের নায়কদিগের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ চাই। উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়া স্থিতি দুর্জ্জেয়া হইয়া গতি রোধ করিয়াছিল, এক্ষণে ইংরেজি শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তাহা না হইয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে। ভরসা ধর্ম্মের উপর। এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে, ব্রাহ্মবাদী এবং পজিটিবিষ্টে, এক মত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দু ধর্ম্মে।

দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি।

বলা বাহুল্য, প্রচার-লেখকেরা এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি বিবেচনা করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। এখনকার নব্য ভারত-সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার বল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। বৃত্তি গুলির অনুশীলনের নামই শিক্ষা। আর নবজীবনে দেখাইয়াছি যে সেই অনুশীলন হইতেই ধর্ম্ম। যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি। হিন্দু ধর্ম্মেরও তাৎপর্য্য এই যে, শিক্ষা ধর্ম্মের অংশ। আদিম কালে যাহা অধ্যয়নীয় শাস্ত্র ছিল, তাৎকালিক হিন্দু ধর্ম্মে সেই সকলের অধ্যয়নই আদিষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে শাস্ত্রান্তর যদি লোক-শিক্ষার অধিকতর উপযোগী দেখা যায়, তাহারই অধ্যয়নই প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ঋষিগণ উপস্থিত থাকিলে অবশ্য স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের আদিষ্ট ধর্ম্মের এই স্থূল মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, ইংরেজি শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতিতে গতিতে বিরোধ থাকিবে না। তখন ‘Order” ও “Progress” এক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজের স্থিতি ও গতির মধ্যে বিরোধের ধ্বংস করিয়া, স্থিতির বল, ও গতির বল, উভয়কেই এক বলে বর্দ্ধিত করিয়া, সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই নব্য হিন্দু ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

পাখীটি কোথায় গেল ?

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন ? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন ?' মানুষটি বলিল—'পাখী পুষিবেন কি ?' আমি কখনও পাখী পুষি নাই। পাখী পুষিতে কখনও সাধও হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড়ই ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখনও পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?'—কি জানি কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল, মনে হইল বুঝি আমি পাখীটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কতই কষ্ট দিবে—পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—আবার অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে তাহাকে কতই কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তায় আবার দেখিলাম যে পাখীটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে জড়সড় হইয়াছে, বুঝিবা কতই আকুল হইয়াছে, বুঝিবা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে! বড়ই দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—পুষিব। মানুষটি বলিল, আটটি পয়সা পাইলেই পাখীটি দি। পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং এক প্রতিবাসীর নিকট হইতে একটা খাঁচা লইয়া পাখীটিকে তাহাতে রাখিয়া তাহাকে দুধ ছাতু ও জল খাইতে দিলাম। দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তবু পাখীটি খাইল না। অন্ন

মুদিত নেত্রে আস্তে আস্তে খুঁকিতে লাগিল। মনে হইল বুঝি আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়া ভয়ে খাইতেছে না। একটু সরিয়া গেলাম। পাখীটি আমাকে আর দেখিতে পাইল না। খানিক পরেই একটু ছাতু ও জল খাইল। আমি বুঝিলাম--আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়াই এতক্ষণ খায় নাই। কিন্তু দুষ্‌মুনের ঘরে দুষ্‌মুনের সামগ্রী খাইল ত। আমি তাহার এত সুখ এত সামগ্রী হরণ করিয়াছি—কিন্তু আমার ঘরে আমার জিনিস খাইল ত। পেটের দায় এমনি দায়। পেটের মতন যন্ত্রণা জগতে আর নাই—পেটই ত জগতে এত কলঙ্কের মূল। আমার পাখী পেটের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারিল না—পেটের জন্য দুষ্‌মুনের জিনিস খাইয়া কলঙ্কে ডুবিল। বুঝিলাম আমাদের ন্যায় পাখীও ক্ষুদ্র; পাখীও দুর্ব্বল। পাখীর উপর মায়া হইল। সে দিন আর পাখীর কাছে গেলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি পাখী দিব্য খাওয়া দাওয়া করিয়াছে। ছাতুর বাটিতে ছাতু প্রায় নাই, জলের বাটিতে জলও কিছু কম এবং খাঁচার নীচে মেজের উপর কিছু ছাতুর গুড়া এবং দুই চারি ফোঁটা জল পড়িয়া আছে। বড় আহ্লাদ হইল। পাখীর কাছে গেলাম। পাখী সরিয়া খাঁচার এক কোনে গিয়া বসিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাখীও সেই এক ঘন্টা কাল সেই কোনে বসিয়া রহিল কিছু খাইল না। আমি সরিয়া আসিলাম—পাখীও খাইতে লাগিল। তখন আবার ভাবিলাম—পাখী আমাকে এখনও দুষ্‌মুন ভাবিয়া খাইতেছে না। ভাল, এমন করিয়া খাওয়াইতেছি তবুও পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিতেছে? ভাবিবে না ত কি? সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল পেটে খাইতে দিতেছি বলিয়া কি সে আমাকে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিবে? পেটটা কি এতই বড়? তবে কেন পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিবে না? কিন্তু দুষ্‌মন হই আর যাই হই, আমি পাখীকে পয়সা দিয়া কিনিয়াছি ত বটে; তবে কেন পাখী আমার হয় না? মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের হয়; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের মন যোগায়, গোলামি করে, গুণগান করে, সবই করে; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষকে গতর দেয়, মানমর্য্যাদা দেয়, পুণ্যধর্ম্ম দেয়, সব দেয়। পাখীকে পয়সা

দিয়া কিনিলাম তবে কেন পাখী আমার হয় না, আমাকে কিছু দেয় না? কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। বোধ হইল বুঝি পাখী নীচ জন্তু, পয়সার মাহাত্ম্য জানে না, পয়সার জন্য সব করা যায় সব দেওয়া যায়, এ উচ্চ মানব-নীতি বুঝিতে পারে না। আরো দুই চারি দিন গেল। আবার একবার পাখীর কাছে গেলাম। দেখি সেখানে আমার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে। পাখী আমাকে দেখিয়া আর তেমন করিয়া সরিয়া গেল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি তাহার সহিত পাখীর কথা কহিতে লাগিলাম। পাখী খাইতে লাগিল। বুঝিলাম পাখী খাঁচা চিনিয়াছে। মনে দুঃখ উথলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া উঠিয়া নামিয়া নামিয়া যার আশ্ মিটে না, কেন তাহাকে, হায়! হায়! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলাম! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচা চিনাইলাম! কেন তাহাকে অনন্ত ভুলাইলাম! এ মহাপাতক কেন করিলাম! দুই এক দিন বড়ই কষ্টে গেল। এক একবার মনে হইতে লাগিল পাখীকে উড়াইয়া দি। একবার খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়া একটা জানালার উপর বসিল। আবার মনটা কেমন করিতে লাগিল—পাখী পালায় ভাবিয়া প্রাণটা কেমন হইয়া গেল—অমনি পাখীকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলাম। আপনার কাছে আপনি হারিলাম। কেন হারিলাম বুঝিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই কি মহাপাতক করিলাম?

এক দিন ছেলেগুলিকে লইয়া পাখীর কাছে বসিলাম। পাখী যেন কতই আহ্লাদিত হইয়া খাঁচার ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল এবং একবার এ ছেলেটির দিকে একবার ও ছেলেটির দিকে যাইতে লাগিল। আমরা সকলে আহ্লাদে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং করতালি দিতে লাগিলাম। পাখী ভয় পাইল না—তেমনি লাফালাফি করিতে লাগিল। আমি একটু ছাতু লইয়া পাখীকে খাইতে দিলাম—পাখী খাইল না। আমার একটি ছেলে একটু ছাতু লইয়া খাইতে দিল, পাখী টুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মনে হইল আমার ছেলেগুলির সহিত পাখীর ভ্রাতৃভাব হইয়াছে—ছেলেগুলিকে বলিলাম, উটি তোমাদের ভাই। সেই দিন হইতে পাখীটিও আমার ছেলে হইল। পাখীটিকে আমার হৃদয়ের

খাঁচায় পুরিলাম। সে খাঁচার সীমা নাই, অর্গলযুক্ত দ্বার নাই, আশে পাশে মাথায় পায় ঠেকে এমন কাটির কাঠাম নাই। পাখীকে সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ খাঁচায় পুরিলাম। মহাপাতকের ভয় কোথায় চলিয়া গেল। মন আনন্দে মজিয়া উঠিল। পাখী ও আর তাহার বাঁশের খাঁচায় এখানে ওখানে ঠোঁট গলাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে না। এখন বাঁশের খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখি, পাখী উড়িয়া যায় না। খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখিলে পাখী এক আধবার আমার কাছে আসে, এক আধবার আমার ছেলেদের কাছে আসে, আবার নাচিতে নাচিতে খাঁচার ভিতর গিয়া বসে। খাঁচা এখন পাখীকে বড় মিষ্ট লাগে। খাঁচার এখন আর সীমা নাই, খাঁচা এখন অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ। খাঁচার এখন আর কাটির কাঠাম নাই—আশে পাশে মাথায় পায় লাগে এমন কাটির বেড়া নাই। খাঁচা এখন পাখীর বড়ই সখের বড়ই সাধের ঘর। পাখী এখন খাঁচার নেশায় ভোর। আমি এখন পাখীর সহিত কত কথা কই, পাখীও কত কথা কয়—যেন কত আদরের, কত আব্‌দারের কথা কয়, কত চেনা দেশের কথা কয়, কত অচেনা দেশের কথা কয়, কত হাসে, কত কাঁদে, কত গান গায়, কত বকে, কত ঝকড়া করে, কত অভিমান করে, কত ভাব করে, কত ভ্রুকুটি করে, কত ভণ্ডামি করে। পাখীকে আমি কত রকম করিয়া দেখি, পাখীও আমাকে কত রকম করিয়া দেখে। পাখীর খাঁচা খুলিয়া দি। পাখী আসিয়া আমার কাঁধের উপর বসে, আমার হাতের উপর বসিয়া ছাতু খায়। আমি এখন আর পাখীর সে দুষ্‌মন নই। আমি এখন পাখীতে মজিয়াছি, পাখীও এখন আমাতে মজিয়াছে। এখন অনন্ত আকাশ হৃদয়ের অনন্তত্বে ডুবিয়া গিয়াছে—পাখী এখন আর অনন্ত আকাশ খোঁজে না, তাহার অনন্ত আকাশের তৃষ্ণা আর নাই। সে এখন আকাশের অনন্তত্ব ভুলিয়া হৃদয়ের অনন্তত্বে মিলাইয়া গিয়াছে। অনন্ত বিশ্ব হৃদয়ের ভিতর বিন্দু অপেক্ষাও বিন্দু। বিশ্ববিন্দু হৃদয়ের কাছে কোন্ ছার? কিন্তু হৃদয়ের ভিতর অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত হৃদয়। হৃদয় বিশ্ব-দ্রাবক, বিশ্বের বিশ্ব। আমার পাখী সেই বিশ্বের বিশ্বে পশিয়াছে। তাহার কি আর সেই তুচ্ছ অনন্ত-আকাশের কথা মনে থাকে?

আহা! আমার সে পাখী আর নাই! আজ চারি দিন হইল আমার সে

পাখী মরিয়া গিয়াছে! মরিয়া কোথায় গিয়াছে? কে বলিবে কোথায় গিয়াছে? কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি যে সে মরিয়া অনন্ত হইয়াছে। আজ আমি যেখানে যে রঙ দেখি সেখানে সেই রঙে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে চোক্ দেখি সেখানে সেই চোকে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে ঠোঁট দেখি সেখানে সেই ঠোঁটে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। আজ আমি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল হীম তাপ পাহাড় পর্ব্বত ধূলা বালি বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ নরনারী সকলেতেই আমার সেই পাখী দেখিতেছি, হাড় হাড়ে আমার সেই পাখী অনুভব করিতেছি। আজ অনন্ত বিশ্বে আমার সেই পাখী ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ আমিও আমার সেই পাখী-ময, এই অনন্ত বিশ্বও পাখী-ময়। তাই আমিও আজ কি মধুময়, আমার অনন্ত বিশ্ব ও কি মধুময়। আমার ক্ষুদ্র পাখী আজ অনন্ত কায়া ধারণ করিয়া অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক ফোঁটা পাখী আজ অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছে। তাইতে অনন্ত বিশ্ব ও অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে সেই এক ফোঁটা পাখীতে মজিয়াছিলাম, তাইত আজ অনন্ত বিশ্ব দেখিলাম, অনন্ত বিশ্বে মজিলাম এবং অনন্ত বিশ্ব আমাতে মজিল। তাইত আজ অনন্ত হইলাম। তাইত আজ বুঝিলাম যে ফোঁটার ভিতরেই বিশ্ব ফোটে, ফোঁটা অনন্তেরও অনন্ত।

আমার পাখী আছে বৈ কি। কিন্তু আমার ছোট ছেলেগুলি আমাকে এক একবার জিজ্ঞাসা করে—পাখীটি কোথায় গেল?

৫ই চৈত্র ১২৯২। শ্রীচঃ—

সান্ত্বনা।

কে তোমরা কাঁদ মোর তরে—
কে তোমরা সংসারের জীব,
আমি ত গো তোমাদের নই;
এক দিন ছিনু তোমাদের,
কেঁদেছিনু তোমাদের মত
সংসারের দুঃখ বুকে সই!

মায়ার স্বপনে আত্ম ভুলে,
যত দিন ছিনু আমি হোথা,
দেখে শুনে তোমাদের মুখ;
তোমাদের আনন্দ উল্লাসে,
তোমাদের রোগ শোক দুঃখে,
পেয়েছি গো বহু দুঃখ সুখ।

হোথা যে রবনা চিরদিন
জানিতাম এ কথা তখনো,
এক দিনও কিন্তু ভাবি নাই;
প্রবাসে হইয়ে আত্মহারা
ভুলিলাম নিজের সম্বল,
আজ্‌ও তাই কত ব্যথা পাই।

আপনার কাজ ভুলে গিয়ে
অসার ভাবনা ভেবে ভেবে
তোমরাও কেঁদোনা গো আর;
মোর মত বড় ব্যথা পাবে,
কাতর হইবে বড় প্রাণে,
এই বেলা কর প্রতীকার।

তোমাদের স্নেহের পুতলী
তোমাদের স্নেহ-হারা হয়ে
এসেছি বলে কি পাও ব্যথা ?—
হেথা কি গো স্নেহের অভাব—
অবারিত অনন্ত স্নেহের
কোলে আমি শুয়ে আছি হেথা।

মায়ার শিকল কেটে দিয়ে,
অসার বাসনা ছুড়ে ফেলে,
এসেছি গো আপনার দেশ ;
তোমাদের অনিত্য ভাবনা
এখানে আমার কিছু নাই,
নাই কিছু সাংসারিক ক্লেশ।

খুলে ফেল মায়ার শৃঙ্খল,
ছেড়ে দাও অসার ভাবনা,
তোমরাও মোরে ভুলে যাও ;
জগতের গতি এইরূপ
চিরদিন এইরূপ হবে,
তবে কেন কেঁদে কষ্ট পাও!

মহাশক্তি।

(২) আমাদের দেশে, এমন কি যে দেশে ভাষার প্রচলন আছে, সেই দেশেই, একটী কথায় আছে "সবুরে মেওয়া ফলে" (English version:— Patience is bitter but its fruits are sweet)। এটীর অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল ধৈর্য্যে যে পরিমাণে মানসিক বলের ও শক্তির প্রয়োজন তাহাতে পরে সেই পরিমাণে সেই বলের কার্য্য ও ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। আপাততঃ কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক ত্যাগস্বীকার করিলে, পরে তাহার ফল অতি সুস্বাদু হইবারই কথা, কারণ ঐ শক্তির অনুরূপ পরিমাণ (Equivalent) পরে সুস্বাদু ফলে পরিণত হইবে। একটী পাঠ একশত বার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, একবার কাগজে কলমে করিলে ঠিক তদনুরূপ ফল হয়। ইহার অর্থ এই যে একশত বার পড়িতে যে শক্তি আবশ্যক হয় একবার মাত্র লিখিতে তত টুকুর প্রয়োজন, অতএব দুইয়েরই ফল সমান। (এস্থলে আমরা শ্রুতধরের কথা বলিতেছি না) এই জন্যই আমরা যৌবন-প্রাপ্ত লোকদিগকে বারম্বার বলিয়া আসিতেছি যেন তাঁহারা এককালে সুখ-পঙ্কে নিমজ্জিত না হন। এই সময় সুখাস্বাদ করিলে তাহার বিষময় ফল পরে পরিলক্ষিত হইবে। সুখের দোলায় দোলায়মান থাকিলেও, অন্ততঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করিবে। মানুষ সর্ব্বদাই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখান্বেষণেই রত হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মবশে, মনুষ্যজীবন সমভাবে সুখদুঃখময়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জীবনে মরীচিকাবৎ। এই জগতে অধিকাংশ লোকই দুঃখটুকু ছাঁকিয়া সুখটুকু আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, দুঃখকে স্বকরে আলিঙ্গন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। কেবলমাত্র তিনটী শ্রেণীর লোক দুঃখকে প্রধান শিক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। কোনটী স্বাভাবিক তাহা আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। বাস্তবিক জগতে থাকিয়া ভাল আশা করা কেবল আশা মাত্র। সেই তিন শ্রেণীর লোক এই :—

(ক) যাহারা ভোগে ও ভোগাভিলাষে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, দুঃখের নানাপ্রকার

সুমিষ্ট ফলগ্রহণ ও আস্বাদন করিয়াছে, ইহার যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ করিয়াছে, শেষে সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া এক্ষণে এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান রহিত।

(খ) যাহারা সন্তোষ শিক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ যাহাদের কিছুতেই কষ্ট নাই, বেগ নাই, চাঞ্চল্য নাই, কি সুখে কি দুঃখে, যাহারা সর্ব্বত্রই সমান আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

(গ) যাহারা এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিজাতীয় উৎকট সুখের ফল সন্দর্শন করিয়া সুখে এক প্রকার বিতৃষ্ণ হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই স্থিরনেত্র ও সূক্ষ্মদর্শী, ইহারা সর্ব্বদাই দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে। ইহারা নিজে সুখজিত না হইলেও অপরের কথা ও বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একপ্রকার জয়ী হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষালাভের ফল পরে দেখান যাইবে। ইহাতে বিশেষ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণতা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এক্ষণে ধৈর্য্যশিক্ষার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের নবীনা যুবতীরা ও নব্য যুবকগণ অধিকাংশ সময়ই নভেল ইত্যাদি সুখ ও সহজপাঠ্য পাঠে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। নভেল পঠন দুই প্রকার—(১) আমোদের জন্য (২) শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। প্রথমটীতে কিছুই ফল নাই, কারণ তাহাতে ধৈর্য্যের আবশ্যক করে না। দ্বিতীয়টীর ফল অতি উত্তম ও মধুর, কারণ তাহাতে বিশিষ্ট শ্রম, শক্তি, বিবেচনা ও মস্তিষ্কচালনার আবশ্যক। প্রথমটীর ফল এক প্রকার মানসিক বিকার মাত্র। দ্বিতীয়টীতে মনঃসংযোগ, ধৈর্য্য আবশ্যক করে বলিয়াই ইহার ফল মানসিক উন্নতি ও শিক্ষালাভ। প্রথমটীতে এইগুলি প্রয়োগ করিতে হয় না বলিয়াই ঐরূপ পাঠের ফলোদয় কিছুমাত্র হয় না, পাঠের কার্য্যকারিতা বিশেষ উপলব্ধ হয় না। আবার দেখ, ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথে কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি, কত আশঙ্কা, কত লজ্জা, কত সংশয়, কত কষ্ট। এইগুলিকে জয় করিতে যে শক্তির প্রয়োজন ঠিক তাহার অনুরূপ শক্তির বিকাশ পুণ্য-ফলরূপে সঞ্চিত হয়। এই শক্তির এবম্বিধ স্ফূরণই জীবনের প্রধানতম ও প্রিয়তম লক্ষ্য। পাপকর্ম্মে বাধা নাই, ব্যাঘাত নাই বরং উপস্থিত আমোদ আছে ও উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে, এই জন্যই ইহার ভবিষ্যৎ এত শোচনীয়। এই জন্যই

অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, গরিমার পতন হয়, কামের ফলভোগ হয়, উচ্চাশার ব্যাঘাত হয়।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, আস্বাদর, অভিমান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মন যৎকালে একই প্রকার নিয়মবশে বাহ্যজগতের ন্যায় চালিত হইতেছে তখন সুখ দুঃখ ইত্যাদি মনুষ্যেরই বা কতটা অধীন আর অদৃষ্টেরই বা কতটা অধীন? এ প্রশ্নের উত্তরের আমরা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি। এক্ষণে বলিব যে, যে সুখ শরীরকে সুখী করে তাহা মনুষ্যের অর্থাৎ কুৎশক্তির (Physical-force) অধীন। আর যে সুখ মনকে সুখী করে তাহা চিৎশক্তির (Psychical-force) অধীন। এই Psychic force আমাদের জ্ঞান (Consciousness) উৎপাদন করে বলিয়াই আমরা শারীরিক কষ্টকে দূরে ঠেলিয়া মানসিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সুখ দুঃখ ক্রমশঃ আমাদের শরীরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অপরের স্বাভাবিক হৃদয়ভেদী ক্রন্দন দর্শনে আমরাও নয়নজলে অভিষিক্ত হই; আবার শিশুর স্বাভাবিক মধুর হাসি দর্শন করিয়া আমাদের মনে অপার আনন্দ আসিয়া জুটে। এরূপ হয় কেন? যখন ঐ অদ্বিতীয় শক্তিটী একবারে হঠাৎ কার্য্য না করিয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কার্য্য করে, তখনই আমাদের প্রকৃত অভ্যাস আরম্ভ হয়। আর যখন সহসা আসিয়া ইহার প্রচণ্ড কার্য্যকারিণী শক্তি দেখাইতে যায়, তখনই আমাদের হৃদয়ে এক একটী উচ্ছ্বাসের সৃজন হয়। যে শক্তি শিশুর হাসিটী উত্থিত করিতেছে তাহা এত স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্য করিতেছে যে, তাহার এক অংশ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দেয়—তাহাতেই আমাদের ঐরূপ আনন্দ উপস্থিত হয়। যাহার হৃদয় নাই, মমতা নাই, প্রেম নাই, সহানুভূতি নাই, তাহার মন ঐ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে না বরং বিকৃত ভাবে কার্য্য করিয়া হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির উদ্রেক করায়। সে হৃদয় স্বাভাবিক হৃদয় নয়। আজ কাল একপ্রকার সভ্যতার গুণে এই হৃদয় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। আজ কালকার সভ্যতালোকে আলোকিত হৃদয়ে মমতা, দয়া শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আজ অভ্যাগত অতিথি মুষ্টিভিক্ষা পায় না, আজ অর্থ দিয়া ভাসা ভাসা

পরোপকার হয়, কিন্তু হৃদয় দিয়া পরোপকার অতি বিরল। আজ ধনীর মানই মান, গরীবের মান ছাই—তাহারা আজ সমাজের একঘরে। তাই কি মেকলে (Macaulay) বলিয়াছেন "As civilisation gradually advances poetry begins necessarily to decline.

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা সচরাচর কৃৎশক্তিটী অনায়াসেই আয়ত্ত ও উন্নত করিতে পারি। এটী বাহ্যিক শক্তি বলিয়া আমরা সাধারণ বাহ্যিক নিয়মে, প্রত্যক্ষ প্রণালীমতে পরিণত করিতে সমর্থ হই। উপযুক্ত আহার দ্বারা, উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা, উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা, উপযুক্ত সদনুষ্ঠান দ্বারা, আমরা কৃৎশক্তির অতি সহজেই উন্নতি সাধন করিতে পারি, কিন্তু চিৎশক্তির উন্নতি তত সহজে হয় না। সেটী আন্তরিক শক্তি, তাহার ভিতর অনেক গূঢ় কাণ্ড নিহিত আছে। কার্য্যদ্বারা তাহার বাহ্যিক স্ফূরণ বা বিকাশ হয় না। কি উপায়ে তাহার উন্নতি ও পরিণতি হয় আমরা সবিশেষ তাহা অবগত নই। কিন্তু ঐ সমস্ত অবক্তব্য উপায়গুলি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা বহু শ্রমসাপেক্ষ। বাস্তবিক চিৎশক্তির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত গুরু ও দেশ কাল পাত্রের প্রয়োজন, সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম কৃৎশক্তির স্ফূরণ যত শীঘ্র হয়, চিৎশক্তির স্ফূরণ তত শীঘ্র হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাহ্যিক উন্নতিবিধান করিতে—আহারের তদ্বির, বসন ভূষণের পারিপাট্য, স্কুল, কালেজ, পাঠশালা, আশ্রম, রাস্তা ঘাট, রেল, ডাক, তার, সভা, সমিতি, সম্বাদ ও সাময়িকপত্র, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, বক্তৃতা ইত্যাদির জন্য চিৎশক্তির কিছুই প্রয়োজন নাই। এ গুলি পার্থিব উন্নতি, এগুলি অর্থের দ্বারা বিস্তীর্ণ হয় ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার যে প্রকার উন্নতি কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা লাভ হয় তাহাই পার্থিব উন্নতি। আজকাল নব্য বাবুরা যে উন্নতির জন্য কণ্ঠস্বর বহির্গত করিয়া থাকেন তাহা পার্থিব উন্নতির আদর্শ। স্বর্গীয় উন্নতির চরমসীমায় ভারতবর্ষ এককালে উঠিয়াছিল। সে উন্নতি অন্য দেশের পক্ষে অভিনব বোধ হইলেও ভারতের পক্ষে নয়। আজ কালের বশে ও অভ্যাসের দোষে, সে উন্নতি আর উন্নতি বলিয়া গণ্য হয় না বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, ঐ উন্নতির

ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অদ্যাপি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয় তাহাও লোক বিশেষের মধ্যে। সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে সে উন্নতির আদর আমরা কই দেখিতে পাই? শেষোক্ত উন্নতির আদর নাই বলিয়া ও পূর্ব্বোক্ত উন্নতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াই মেকলে বলিয়াছেন "—যে দেশে পার্থিব উন্নতি প্রবেশ করিয়াছে সে দেশ হইতে হৃদয় চলিয়া গিয়াছে, উন্নত গভীর ভাব সে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দয়া মায়া সে দেশের বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সে দেশের অন্তঃসারবত্তা কিছুই নাই"।

(৩)। অঙ্কশাস্ত্রে বলে "Friction adapts itself to motion" অর্থাৎ গাড়ীখানি প্রথমে চালাইতে ঘোড়ার যতটুকু কষ্ট হয় শেষে তত হয় না, ক্রমশঃ গতি সহজ হইয়া আইসে। এইরূপ misery adapts itself to progressin this world অর্থাৎ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে কষ্ট ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইযা যায়, যদিও প্রারম্ভে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। যাহার হৃদয় স্বাভাবিক, তাহার হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে আবিষ্ট হইলে স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। এই হেতু স্বাভাবিক কার্য্যাবলী অভ্যাস দ্বারা অনায়ত্ত থাকে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য স্বাভাবিক বলিয়াই সে গুলি আয়াসসাধ্য। ঈশ্বর লোক বিশেষকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সেই বৃত্তি গুলির সম্যক্ পরিচালনা করিলেই সেইগুলি সফলতা প্রাপ্ত হয়, নচেৎ হয় না। এই বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক নিয়মে হয় ও সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য ঐ ঐ বৃত্তিসাপেক্ষ বলিয়াই সমস্ত ধর্ম্মই অভ্যাসদ্বারা লব্ধ হইতে পারে।

(৪) আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক ভেদে দুইটী স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে। সামাজিক কঠোরতায় ও সামাজিক নীতি পদ্ধতির (etiquette) সুদৃষ্টান্তে মানুষের অন্তরে যে ক্ষণিক ভাবমূলক প্রকৃতির উৎপত্তি হয় তাহাই বাহ্যিক প্রকৃতি। অবশ্যই আন্তরিকের সহিত ইহার বহুল পরিমাণে সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত ভাবের পরিণতি ও স্ফূর্ত্তি হয়। আন্তরিক প্রকৃতিটী স্বভাব ও কতকটা সংস্কারজাত। অবস্থাভেদে প্রথমটীর পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু শুদ্ধ অভ্যাস

ব্যতীত, অন্য কোন শক্তিদ্বারা দ্বিতীয়টীর পরিবর্ত্তন নাই, ও সম্ভবও নয়। আন্তরিক প্রকৃতি বাহ্যিক প্রকৃতিটীকে কখন কখন চালিত করে, কিন্তু সকল সময় নয়, কারণ সময়ে সময়ে শেষোক্তটিই বেশী প্রবল হইয়া উঠে। আন্তরিক প্রকৃতিটী নিজবশে রাখিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রয়োগভেদে শিক্ষাও আবার দ্বিবিধ—Practical ও Theoretical। মন যাহা ইচ্ছা করে, শরীর যদি তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইল। শিশুগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও একটী রমণীয় দ্রব্য ধরিতে পারে না, কারণ শিশুদের উভয় শিক্ষাই অসম্পূর্ণ। শুদ্ধ theoretical শিক্ষার দোষ এই যে মনের ভাব মনেই বিলীন হইয়া যায়, বাহিরে তাহার স্ফূরণ হয় না। লোকে জানে "কখনও মিথ্যা কথা কহিওনা"—ইহাতে দোষ আছে তাহাও বিশেষরূপে জানে। কিন্তু তথাপি মিথ্যা কয় কেন? কারণ তাহাদের এ বিষয়ে Practical শিক্ষা হয় নাই। যে বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই ত অধিকাংশ নীতিবাক্য হৃদয়-ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত কবিতে পারে কয় জন? যদ্যপি কাহারও একটী অসংকার্য্যে মতি হয় তাহা হইলে তাহার সেই কুমতি শুদ্ধ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ফিরিলে বা ফিরাইলে যত উপকার হয়, কার্য্যে (Practically) অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতার বলে ও নিজে সেই অসৎকার্য্যের ফলভোগ করিয়া ফিরিলে বা ফিবাইলে তাহার অপেক্ষা শতগুণ উপকার দর্শে। সেই জন্যই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেশপর্য্যটন (continental tour) শিক্ষার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ ইহাতে কার্য্যতঃ অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুবিধা আছে। আমাদের একটা কথায় আছে—

একবার যোগী, দুবার ভোগী,
তিন বার হ'লেই, হ'ল রোগী।

অর্থাৎ লোকে একবারমাত্র পাপকরিলে তাহাকে যোগী বলা যাইতে পারে, দুইবার পাপ করিলে পাপের ভোগ হইল বটে কিন্তু প্রকৃত পাপী নাম হইল না। তিন বার পাপ করিলেই আর নিস্তার নাই, ঐ কার্য্যটী তাহার রোগের মধ্যে হইয়া গেল—সে কখনও আর এ পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার কারণ এই যে একটী লোক একবারমাত্র পাপ করিলে সে একটী

অবৈধ শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু পরে তাহার জ্ঞানোদয় হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত যেটুকু ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহা যদি করে তাহা হইলে ঐ ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ সে পরে ততোধিক সাধু হয়। কারণ যদি সে এককালেই অধর্ম্ম না করিত তাহা হইলে তাহাকে আর ধৈর্য্য প্রকাশ করিতে হইত না। তাহা হইলে সেই শক্তির ততটা আবশ্যক হইত না, তাহা হইলেই তাহার যোগী নাম সার্থক হইল। দুই বার প্রলোভনে পড়িয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যোগী নামের আরও সমধিক সার্থকতা হয় বটে, কিন্তু তখন তাহাকে ভোগী বলিতে হইবে। কিন্তু তিনবার প্রলোভনে পড়িলে, মনুষ্যের এরূপ দৃঢ় মানসিক শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে সেই প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন সে একবারে রোগী অর্থাৎ পাপব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ বারম্বার পাপ করিলে সেই শক্তিটী ধৈর্য্যশক্তি টীর উপর বিশেষরূপ আধিপত্য করিয়া বসে, তখন তাহার উদ্ধারের পথ কণ্টকাবৃত হইয়া পড়ে। তাই Shakspere বলিয়াছেন "Best men are moulded out of faults"। তাই, নিজে শিক্ষার গুণে ভাল হইলে উত্তম; অন্যের দেখিয়া চরিত্রসংস্কার করিলে উত্তমতর; নিজের ফলভোগ দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উত্তমতম। কারণ শেষটীতেই Practical শিক্ষার চূড়ান্ত হইল। Theoretical শিক্ষার প্রয়োগ আমাদের মনোবিজ্ঞানে (Philosophy), আর Practical শিক্ষার প্রয়োগ সাহেবদের ডাক্তারী বিদ্যায় (Medical science) ও আমাদের হিন্দুর কার্য্যকলাপে। সেই হেতু Bain বলিয়াছেন "morality is a department of *practice* or it is a knowledge applied to pratice or useful ends, like medicine or politics."

(৬)। আজকাল আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকের ইহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই। না থাকিবারই কথা। ঔষধের ক্রমানুযায়ী তেজঃবৃদ্ধি ইহা সহজে কে বিশ্বাস করিবে? সাধারণতঃ লোকে জানে মাত্রানুসারে ঔষধ কার্য্য করে। কিন্তু আমাদের সম্প্রতি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কর্তা ডাক্তার হানিমান সমস্ত অঙ্গশাস্ত্রবিৎ

পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কোন দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোন শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হইলে তাহার তেজ বর্দ্ধিত হয় কি না? আমরা আমাদের সামান্য সূত্র (principle) ধরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে বাস্তবিক হ্যানিমানের ঔষধের ক্রমপ্রণালী একেবারে ভ্রান্ত নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটী দ্রব্যের পরমাণুগুলির মধ্যে কোন প্রকার শক্তিই বিকাশিত হয় না কিন্তু তাহার উপর বাহ্যিক কোন শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা করিলে সেই শক্তিটী গুপ্তভাবে ঐ বস্তুতে নিহিত থাকে, পরে তাহা দেহের ভিতর প্রকাশ পায়। এই হেতু লঙ্কা কি অন্য দ্রব্যকে যতই পরমাণুসাৎ করা যায় ততই তাহাব কটু আস্বাদন বৃদ্ধি পায়। এইটীই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূল সূত্র—ইংরাজীর strains ও stresses কতকটা এইরূপ, অন্ততঃ এই গুপ্ত শক্তির বিকাশ strain ও stress নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভূত বলিলেও বেশী ক্ষতি হয় না।

(৭)। দৃঢ়সঙ্কল্প এত বলবান্ কেন? আমরা কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি, মানুষ সঙ্কল্পগুণে নিজের ও পরের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়। সঙ্কল্প না থাকিলে আমরা কোন কাজই কবিতে পাইতাম না। একটু বাধা দেখিলে ভীত হইতাম, একটু বিঘ্ন দেখিলে পশ্চাদ্‌পদ হইতাম, লোকের বিদ্রূপে জড় হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে আর আমাদের কার্য্যকাবিণী শক্তি কোথায় থাকিত? অতএব Intensity of will এবং অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্পের এত ক্ষমতা কেন? আমরা এই সঙ্কল্প দ্বারা প্রবল যথেচ্ছাচারী রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে পারি—এই রূপে সেইগুলি সুপ্রণালী পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সম্মুখে ধাবমান হইয়া সঙ্কল্পরূপে অন্যদিকে পরিণত হয়। এই সঙ্কল্পের কত ক্ষমতা তাহা একটী প্রবন্ধে দেখান যায় না। তবে আমরা শুদ্ধ দেখাইব যে অন্যের বিশ্বাসটা এই সম্বন্ধে কতদূর আবশ্যকীয়। আমরা বলিয়াছি অন্যের ইচ্ছায় আর একজনকে বশীভূত করিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস (faith) আবশ্যক। যে শক্তি প্রথম- ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে সেই শক্তিই বা তাহার কোন অংশ সঙ্কল্পরূপে অন্য দিকে চালিত হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে। তবেই প্রথমের সঙ্কল্প যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসের বল প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইচ্ছানুরূপ

ফল পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসরূপিণী শক্তি না থাকিলে প্রথমটীর সঙ্কল্পরূপিণী শক্তি তাহার সহায় না হইয়া তাহার কতকটা প্রতিকূলে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলেই সঙ্কল্প শক্তির একটু হ্রাস হইয়া কার্য্য পক্ষে একটু অন্তরায় হইয়া উঠে। এই রূপ বিশ্বাস থাকিতে সঙ্কল্প না থাকিলে একটু শক্তি হ্রাস হইয়া যায় তাহার ফল ও তদনুযায়ী শুভ বা ইচ্ছামত হয় না। আমাদের স্বস্ত্যয়ন, যজ্ঞ প্রভৃতি এই নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। যাজকের সঙ্কল্প ও যজমানের স্থির বিশ্বাস বা ভক্তি এই উভয়ে মিলিত হইয়া ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। কিন্তু আজকাল যাজকেরও সঙ্কল্প নাই, যজমানেরও ভক্তি নাই, কাযে কাযেই ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহাতে প্রতীয়মাণ হইতেছে যে একদিকে শুদ্ধ সঙ্কল্প কিম্বা শুদ্ধ ভক্তি থাকিলেও ঈপ্সিত ফলের অর্দ্ধেক লাভ করা যায়। কারণ একটী মাত্র শক্তিই যৎকালে বিভিন্নরূপ ধারণ পূর্ব্বক একজনকে ইচ্ছা রূপে এক জনকে ভক্তিরূপে শাসন করিতেছে তখন তাহার অংশের দ্বারা আংশিক ফল লাভ করিব না কেন? এই শক্তির আর একটী বিশেষ গুণ আছে। যদ্যপি সঙ্কল্পকারী ও ভক্তিদায়ী এই দুইএর মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা কিম্বা অন্য কোনরূপ অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে তাহা হইলে এই শক্তি আরও বেশী কার্য্যকারী হয়; কারণ এই নতন শক্তিটী আবার সেই দুইএর শক্তিটীকে অধিকতর সম্বদ্ধ করে। কাযেই ফল বেশী হইবার সম্ভাবনা। তাই কোন কবি বলিয়াছেন—

"আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।"

ভক্তির আর একটী উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই, সকল ধর্ম্মের সার ভক্তি। ভক্তিতে লাভ করা যায় না এমন ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ। যাহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিরূপা শক্তি আছে, তাহার সমস্তই আছে। সকল ধর্ম্মের মূল, সকল ধর্ম্মের সার, সকল ধর্ম্মের অন্ত যে ভক্তি—সে ভক্তি যার আছে তাহার কিসের অভাব?

আভীরা।

(১)

দূর শূন্যে নীলছবি পাহাড়ের তলে
ছেয়ে আছে শ্যামল প্রান্তর !
দূরে দূরে সারিগাঁথা তালরাজি শিরে
কাঁপিতেছে ক্ষীণ রবিকর !

(২)

দিশাহারা ভাসি চলে মেঘ-পোত গুলি
গগণের নীলিমা-সাগরে !
চমকি দেখিছে ধীরে জ্বালিতেছে দূরে
কনকাদ্রি পাহাড়ের শিরে।

(৩)

আভীরা কিশোরী বসি সপ্ত পর্ণ মূলে
কাছে বসি নওল কিশোর !
বিচরিছে কাছে কাছে গাভী বৎস গুলি
দুঁহে দোঁহা নেহারিতে ভোর।

(৪)

বালিকা মাধুরী নামে, কিশোর রাখাল,
প্রতিবেসী কুটুম্বের ছেলে—
চির সাথী-সখী সখা, শিশুকাল হতে,
দিবস কাটিছে হেসে খেলে !

(৫)

প্রীতিসরলতামাখা মাধুরীর মুখে—
ভাসিতেছে হাসির কিরণ !
মুক্ত অনিলের সখী, বনের ব্রততী,
তেমনি সে ভোলা খোলা মন।

(৬)

চাহি চাহি সে আননে সুখে ভরা বুক
সখা বলে " সইলো মাধুরি !
প্রভাতে শুনেছি আজি সুখের বারতা "
মাখা তাহে আনন্দ লহরী !

(৭)

" মাথা খাস্, কি কথাটী বল্‌না, রাখাল ! "
ঝরে মধু ধীর মৃদুভাষে !
সখা হেরে নব শোভা মাধুরী-আননে
আগ্রহের আলু থালু বেশে।

(৮)

বলে সখা—" শুয়েছিনু কুটীরে যখন,
মা বাপের কথা গেল কানে !
দোঁহে বলিছেন, হবে সুখপরিণয়,
রাখালের মাধুরীর সনে ! "

(৯)

পলকে শুকায়ে গেল মধুর মাধুরী,
মেখে হায় সলিল দর্পণ !
আবার ভাসিল হাসি তখনি পলকে
চাহি চাহি সখার আনন।

(১০)

" দাসী তোর পরিণয়ে হব কেন ভাই,
তেয়াগিয়ে বাপের ভবন ?
ঘোমটায় মুখ তবে হবে আবরিতে—
আমা হতে হবে না তেমন !

(১১)

" এম্‌নি করে দুর্ব্বাদলে গোঠের বাতাসে
দুজনে কি ছুটিবারে পাব ?

না রাখাল, ও সব কথা শুনিস্‌নে ভাই,
মা বলিলে আমি তাই কব ! ’”

(১২)

শ্যাম তরঙ্গের রাজি উঠিছে পড়িছে
শস্যক্ষেত্রে অনিল হিল্লোলে !
রাখালে মাধুরী ভোর অবসর বুঝি,
বুধি শনি ধায় কুতূহলে !

(১৩)

তখন চাহিয়ে বালা হেরে গোঠ পানে
অমনি সে লইল পাঁচনী !
নিথর গগণতল কাঁপাইয়ে ডাকে—
“ ফিরে আয় ওলো বুধি শনি ! ”

(১৪)

ছুটি চলে তড়িতের লতিকার মত
আভীরা সে মধুর মাধুরী !
রাখাল চাহিয়ে রহে অনিমেষ আঁখি,
মরমেতে বাসনা লহরী !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সমাজ তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জড় জগতের যেমন বিজ্ঞান আছে, তেমনই মনুষ্য জগতের বিজ্ঞান আছে। জড় জগতের যেমন কতকগুলি শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ; সেইরূপ মনুষ্য জগতের শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রত্যেক

জড় পদার্থের যেমন কতকগুলি শক্তি বা গুণ আছে, তাহার সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ প্রাকৃতিক ঘটনার মূল, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্মের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষই সামাজিক ঘটনা সমূহের মূল। সংক্ষেপতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাসকলের ন্যায় সামাজিক ঘটনাসকলও নিয়মাধীন।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। কোন মহান ব্যাপার দেখিলেই মনে ভয় ও বিস্ময় হইত। প্রবল বাত্যা, বৃষ্টি, জলপ্লাবন অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত, কার্য্যকারণজ্ঞানাবিহীন আদিম মনুষ্য এই সকলকে দৈব কার্য্য বিবেচনা করিত এবং ক্রোধোপশান্তির জন্য অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এখন আর সভ্য জাতিরা গৃহদাহে অগ্নিদেবের পূজা করে না, প্রবল বাতবিক্ষোভিত সমুদ্রে ভাসমান পোতাধ্যক্ষ পবনদেবের স্তব পাঠ করেন না। প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া যেমন বাহ্য জগতের দুর্ঘটনার প্রকৃত প্রতিকার হইতেছে, সেইরূপ সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান ও নিরূপণ হইলে সামাজিক বিশৃংখলার প্রকৃত প্রতিকার হইবে। সামাজিক দুঃখ ক্লেশের কারণ জানা যাইবে, সমাজ সভ্যতার পথে দ্রুত গতিতে যাইতে থাকিবে। জ্ঞান ও সত্য প্রচারিত হইবে, সামাজিক সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

এক্ষণে জানা আবশ্যক সমাজ কি ও তাহার প্রকৃতি কি? আমরা এ স্থলে ইহার নৈয়ায়িক সংজ্ঞা দিব না। সাধারণতঃ সমাজ কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। তবে প্রস্তাবোচিত একটি সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক। বিষয় বিশেষে একতা বিশিষ্ট জনসমূহকে সমাজ বলা যাইতে পারে। যেমন দেশ বিষয়ের একতা লইয়া ইংলণ্ড দেশীয়দিগকে ইংরেজসমাজ, সমস্ত য়ুরোপবাসীদিগকে য়ুরোপীয়সমাজ, বঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গালীসমাজ, বলা যায় সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে একতা লইয়া খৃষ্টিয়সমাজ, হিন্দুসমাজ, মুসলমানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। এবং মানব জাতীয়ত্ব লইয়া সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকে মনুষ্য সমাজ বলা যায়।

এই মনুষ্য সমাজকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১মতঃ, অসভ্য,

বা বর্ব্বর জাতি; ২য়তঃ, অর্দ্ধ সভ্য বা অর্দ্ধ বর্ব্বর জাতি; ৩য়তঃ, সভ্য জাতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্ম আছে। সেই গুলির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের পরিচালনা ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং জড় জগতে প্রকৃতির নিয়ম ও পদার্থসকলের কার্য্যোপযোগিতা জানিতে হয়। এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞান মনুষ্যের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়। যাহারা ইহা না জানিয়া এবং জানিতে চেষ্টা না কবিয়া কেবল জীবন ধারণের জন্য পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে মনুষ্য পশুর সহিত সমান, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যকে পশু হইতে বিশেষ করে; এমন ধর্ম্মে যাহারা বিহীন তাহারা পশু ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে যদি মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত করা যায় তাহা হইলে যে অসভ্য শ্রেণী নিবিষ্ট করা হয় তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাহারা উপরোক্ত বিষয়গুলি কতকাংশে অবগত কিন্তু এরূপ অনভিজ্ঞ অনুৎসাহী ও অনৈক্যশালী যে অন্যে তাহাদিগকে বলে বা কৌশলে—যাহাতে শাসিতদিগের না হউক শাসনকর্ত্তা দিগের উপকার ও লাভ হয়—এরূপ ভাবে শাসিত ও চালিত করে, তাহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলা যাইতে পারে। যে সমাজ এরূপ স্থাপিত, গঠিত ও চালিত যে যাহারা স্থাপয়িতা তাহারাই চালক ও যেখানে জাতিগত ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বত্ব, স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহাকে সভ্য-সমাজ বলা যায়। বলা বাহুল্য যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞানে এ সমাজ জ্ঞানী এবং অধিক জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় নূতন তত্ত্বের আবিষ্করণে যত্নবান্। সেই নিমিত্ত প্রকৃতির শক্তির ও উপকরণের নানা কার্য্যে প্রয়োগ; সময় ও শ্রম লাঘব করিবার জন্য নানা গঠন; জলে স্থলে আরামের জন্য আশ্চর্য্য অশ্চর্য্য নানা যান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুশৃংখলা ও ন্যায়পরতা; বিধি, বিজ্ঞান ও শিল্প, সাহিত্য—এ সমাজে সকলই সমুৎপন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইটী উপাদানে সমাজ সংগঠিত—একটি পুরুষ জাতি অপরটি স্ত্রীজাতি। এই দুইএর প্রকৃত সম্বন্ধ বিচার সমাজ তত্ত্ববিদের প্রধান কর্ত্তব্য—কারণ এই সম্বন্ধ সমাজসৌধের ভিত্তি।

সাম্য ও স্বাধীনতা সামাজিক নীতির মূল। পূর্ব্বে স্বাধীনতা দাতব্যের সামগ্রী ছিল। যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত, সেই পাইত, কাহারও তাহাতে অধিকার ছিল না। কোন কোন সম্প্রদায়ের আবার কোন কোন বিশেষ অধিকার থাকিত—যেমন শাসন করিবার অধিকার, কর নির্দ্ধারণের অধিকার, দণ্ডবিধানের অধিকার। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল কাহারও অধিকার নয়—অধিকারী কৃত অনধিকার।

এই অত্যাচার সকল দেশে সকল সমাজে চলিয়া আসিতেছিল—অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। সমাজতত্ত্ববিদগ্রনী সাম্যবাদী মহাত্মা রুসো ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন মনুষ্য জন্মিয়াই স্বাধীন। এই তত্ত্ব যে দিন জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইল সেই দিন যেন জগতে স্বাধীনতার সূর্য্য উঠিল। যে স্বাধীনতায় এতদিন সম্প্রদায় বিশেষের একাধিপত্য ছিল তাহা এখন জনসাধারণের হইল। ১৭৯০ খৃঃ অঃ এই সত্য য়ুরোপীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। এই বৎসর আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের জাতীয় সমিতি (National Assembly) প্রচার করিলেন যে মনুষ্য জন্মাবধিই স্বাধীন ও সমস্বত্ব। এই স্বাভাবিক স্বত্বসংরক্ষণই রাজনৈতিক সভার উদ্দেশ্য। এই সকল স্বত্ব—স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধান।

এই রূপে মনুষ্যর স্বত্ব সকল জগতে পরিচিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উহা এখনও বিশ্বজনীন হইল না। আজিও সমগ্র মানবজাতি ইহা পাইল না। আমরা এখানে কেবল সভ্য জাতির কথাই বলিতেছি। সভ্য জাতির মধ্যেও ইহা সকলে পান নাই। এ পর্য্যন্ত কেবল পুরুষজাতিই এই স্বত্বের অধিকারী, স্ত্রীজাতি ইহাতে বঞ্চিত।

আমরা এ প্রস্তাবে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত, স্ত্রীপুরুষগত

প্রভেদই হইবে বিচার্য্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রথমে নির্ণীত না হইলে তুলনায় বিচার যথার্থ হইতে পারে না। এই জন্যই মূল সত্যের আলোচনায় কয়েকটি কথা সংক্ষেপেও বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ আপাততঃ কি রূপ অবস্থায় আছে এবং কি রূপ হওয়া উচিত।

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট" ইহাই সাম্যতত্ত্বের মূল সত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্য সুতরাং উভয়েরই তুল্য অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু সভ্য সমাজেও অদ্যাপি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ সত্য স্বীকৃত হয় নাই। এবং যত দিন না তাহা হইবে তত দিন সমাজ স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইতে পারে না। কারণ যাহা সত্য নয় তাহা স্থায়ীও হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণীকৃত হইবে যে স্ত্রীজাতির ও পুরুষজাতির ন্যায় সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার আছে। পুরুষেরও যেমন স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে, স্ত্রীর ও সেই রূপ স্বাধিনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচার প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে। পুরুষ ও যেমন কেবল স্বকৃত অপরাধ হেতু পূর্ব্বোক্ত স্বত্বে বঞ্চিত হইতে পারে, স্ত্রীও কেবল সেইরূপ স্বকৃত অপরাধ হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে—অন্যথা নহে। যদি অন্যথা তাহাদিগকে ইহাতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে কতক গুলি মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যে মনুষ্যে সমনাধিকার বিশিষ্ট নহে। অথবা স্বীকার করিতে হয় যে স্ত্রীজাতি মানব জাতির অন্তর্গত নয়। স্ত্রী জাতির স্বত্ব অস্বীকৃত হইলে পুরুষজাতির স্বত্বের কোন ন্যায়ানুগত ভিত্তি থাকে না। তাহা হইলে অত্যাচার আর অন্যায় বলিয়া গণিত হইতে পারেনা, দাসত্ব আর সভ্য সমাজে ঘৃণার পদার্থ বলা যায় না। হয় সকল মনুষ্যের সমান অধিকার আছে, অথবা কাহারও কিছুই নাই।

ইহাতে অনেকে এরূপ তর্ক করেন যে যখন স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে তখন অধিকারগত সাম্য থাকিবে কি প্রকারে ?

আমরা বলি যাহাকে প্রকৃতিগত বৈষম্য বলা হইতেছে তাহা প্রকৃত প্রকৃতিগত বৈষম্য নহে (বলা বাহুল্য আমরা শারীরিক বৈষম্যের কথা বলিতেছি না, অনেকাংশে তাহা অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। অভ্যাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তাহার উপর আবার শিক্ষার দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইলে, প্রায়

প্রকৃতিই হইয়া যায়। আশৈশব একটি বালক ও একটি বালিকার শিক্ষার প্রভেদ দেখুন। বালক খেলা করিবে—দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ছুটাছুটি করিয়া—বালিকা গৃহপ্রাঙ্গনে খেলাঘর পাতাইয়া তখন হইতে গৃহকর্ম্ম অভ্যাস করিবে, মেয়ে ছেলের বিবাহ দিবে, রাঁধিবে, ঘর পরিষ্কার করিবে। বালক বয়োবৃদ্ধির সহিত সংসারের নানা স্থানে যাইবে, নানা লোকের নিকট যাইবে, নানা ঘটনা দেখিবে, নানা সংবাদ, নানা উপদেশ শুনিবে। আর বালিকা বয়োবৃদ্ধির সহিত বহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে, আর দেখা শুনা চতুঃপ্রাচীর-বেষ্ঠীত প্রাঙ্গন মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহাই হইবে। ইহাতে কি পুরুষ বলবান্ স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী স্ত্রী ভীরু, পুরুষ অভিজ্ঞ স্ত্রী অজ্ঞ, পুরুষ কঠোরতাসহিষ্ণু স্ত্রী কোমলা হইবে না? এরূপ শিক্ষায় এরূপ ফল যদি না ফলিবে ত কি হইবে বলিতে পারি না। আমরা লেখাপড়ার কথা অধিক বলিব না, কারণ প্রকৃত শিক্ষা কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া হয় না। জগতের প্রকৃত ঘটনা সমুহ হইতে অন্তরিত হইয়া জগতের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব। মনে করুণ একজন বহুদর্শী কৃতকর্ম্মা লোকের যে পরিমাণে জ্ঞান আছে তাহা হইতে যদি তাহার জগতের প্রকৃত ঘটনার সংস্রবে, সংঘাতে আসিয়া যে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে সেই বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞান বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে যে জ্ঞানটুকু থাকে সে কতটুকু? সেই পুস্তকজ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিতে পারে? যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার নামে খড়্গাহস্ত তাঁহাদিগকে আমরা বুঝাইতে ইচ্ছা করি যে প্রকৃত স্বাধীনতা না দিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যদি শিক্ষা অর্থে এরূপ বুঝিতে হয় যে যাহাতে গৃহে বসিয়া উপন্যাস পাঠ করিতে পারিবে, দুই চারিটী নীরস, অর্দ্ধঅশ্লীল শ্লোক শিখিতে পারিবে এবং শব্দসাগরের বাছা বাছা রত্নগুলিন অযথা প্রয়োগ করিয়া পত্র লিখিতে পারিবে তাহা হইলে আমরা স্বীকার করি যে পিঞ্জর-বদ্ধার এরূপ শিক্ষা অসম্ভব নয়। *

---

* প্রচারে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধের সকল কথার সহিতই যে আমাদের মতের ঐক্য আছে এরূপ কেহ মনে না করেন। কেহ কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রচারেই করিতে পারেন।—প্রঃ-সং।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা অন্যত্র বলা যাইবে। স্ত্রীজাতির পুরুষোচিত কার্য্যে উপযোগিতা আমাদের অনুসরণীয় বিষয়—তাহারই প্রসঙ্গে এতদর আসা গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে—তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি পুরুষজাতির মানসিক শক্তি অপেক্ষা স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল সময়ে ও সকল দেশেই এই নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ যাহা স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মাধীন, তাহা এক সময়ে এক দেশে এক প্রকার, অন্য দেশে অন্য সময়ে অন্য প্রকার—ইহা অসম্ভব। সত্যযুগে ভারতবর্ষে যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ছিল এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকাতে তাহার দাহিকা শক্তি আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের বশে যাহা চলিতেছে তাহার আর দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তন ঘটে না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই ভাব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির এই কথিত নিকৃষ্টতা এত প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে কি না, যাহাতে ইহাকে প্রকৃতিগত বলা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিক বিচারে বিচার্য্য বিষয়গুলি সমাবস্থাপন্ন না হইলে পরস্পর তুলনীয় হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীপুরুষগত বৈষম্য বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা সর্ব্ব বিষয়ে সমান কি না? আমাদিগের যত দূর জানা আছে তাহাতে একরূপ অসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সমান নয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির আপাততঃ যদি কিছু বা যাহা কিছু নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্রাকৃতিক বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পর ইহাও বলিতে হইবে যে, সর্ব্বদেশকালপাত্র-প্রযুজ্য প্রাকৃতিক নিয়মতুল্য স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতাও কোথাও দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। আবার য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, আমেরিকার স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উক্ত দেশ সকলের সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শিক্ষা এই রূপ উপযোগি-

তার হেতু। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ হইতেছে ও ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির যে নিকৃষ্টতা দেখা যায়, তাহা কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া প্রকৃতিগত নহে—সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিক্ষা ও সাধারণ অবস্থাগত। শিক্ষা ও অবস্থার প্রভাবে পুরুষজাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখা যায়, স্ত্রীজাতির মধ্যেও তাহাই। স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ যাহা কিছু দেখা যায় তাহা অবস্থা ও শিক্ষাগত প্রভেদজনিত—তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে।

এক্ষণে নৈয়ায়িক তর্ক ছাড়িয়া দেখা যাউক স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কার্য্যতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। স্ত্রীজাতি অতীতে যাহা হইয়াছে বা বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। কারণ ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, যাহা তাহারা হইয়াছে তাহা তাহারা হইতে পারে—যদিই একান্ত তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু না হয়। তাহারা কালিদাস বা সেক্ষপীয়রের মত কাব্য প্রণয়ণ করিতে পারে কি না অথবা গৌতম বা মিলের মত ন্যায়-শাস্ত্র লিখিতে পারে কি না এরূপ তর্কে এই মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, তাহা অনিশ্চিত—অন্ততঃ সে বিষয়ের মীমাংসা স্বতঃসিদ্ধ নয়—তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু তাহারা যাহা হইয়াছে ও করিয়াছে তাহা কল্পনা বা তর্কের বিষয় নহে—বাস্তব ঘটনা।

যত প্রকার কার্য্য আছে তাহার মধ্যে রাজ্যশাসন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। রাজনৈতিক ব্যাপারে যেরূপ বুদ্ধির পরিচালনা আবশ্যক সেরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। বৈদেশিক রাজগণের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ রক্ষা, তৎ-সম্বন্ধে যুদ্ধবিগ্রহসন্ধির বিষয় আলোচনা করা, সমগ্র দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানে চেষ্টা করা, কার্য্যবিভাগে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করা,-আরও কত সহস্র কার্য্যে দৃষ্টি রাখা—এ সকলে অসাধারণ বুদ্ধির এবং উন্নত, প্রশস্ত, দৃঢ় ও কার্য্যকুশল মনের আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দিতেছে এরূপ কার্য্যও স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত—অতি দক্ষতা, নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত—নির্ব্বাহিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ, স্পেনের ফার্ডিনেণ্ড-মহিষী মেরি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের বর্ত্তমান সময়েও সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইহার জাজ্জ্বল্যমান

উদাহরণ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই কথায় বলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই বিষয়টী বিশেষরূপে সত্য। যখনই দেখা যায় যে, কোন হিন্দুরাজ্য তেজস্বিতা, সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার সহিত শাসিত হইতেছে, যখনই দেখা যায় বিনা পীড়নে শান্তি স্থাপিত হইতেছে, কৃষি বিস্তীর্ণ হইতেছে, প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, তখনই অনুমান করা যাইতে পারে এই রাজত্ব স্ত্রীলোকের দ্বারা হইতেছে, অন্ততঃ এইরূপ প্রত্যেক ৪টার মধ্যে ৩টা নিশ্চিত। মিল বলেন ইহা তাঁহার কাল্পনিক কথা নহে। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে। যদিও হিন্দু নীতি অনুসারে স্ত্রীলোক রাজত্ব করিতে পারে না তথাপি অনেক সময়ে তাহাকে রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আলস্যে ও ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইয়া অনেক রাজাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অপ্রাপ্তবয়স্কতার সময় রাজ্ঞীকেই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহার উপর বিবেচনা করিতে হইবে যে উক্ত রাজ্ঞীরা কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হয়েন না, পর্দ্দার অন্তরাল ব্যতীত কখন কাহারও সহিত কথা কহেন না, রীতিমত লেখা পড়া জানেন না, জানিলেও ভাষায় রাজনীতিবিষয়ক এমন কোন পুস্তক নাই যাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যশাসনে স্ত্রীলোকের এক রূপ স্বাভাবিক ক্ষমতাই আছে।* (১)—[ক্রমশঃ।]

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

---

(১) "Especially is this true if we take into consideration Asia as well as Europe. If a Hindoo principality is strongly, vigilantly, and economically governed, if order is preserved without oppression, if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official knowledge of Hindoo Governments. There are many instances: for though, by Hindoo institutions, a woman can not reign, she is the legal regent of a kingdom during the minority of the heir; and minorities are frequent, the lives of the male rulers being so often prematurely terminated through the effect of inactivity and sensual excesses. When we consider that these princesses have never been seen in public, have never conversed with any man not

রুদ্ধপ্রাণ।

ধর মা ধরারাণি তুলেনে কোলে ছেলে,
বিদেশে কত আর রাখিবি একা ফেলে!
অচেনা ঠাঁই এ যে অচেনা লোক জন,
ধূ ধূ ধূ চারি ধার মরভূ বিভীষণ।
কেহ না ডাকে কারে কেহ না কহে কথা,
চাহিয়ে চ'লে যায় চাপিয়ে মনোব্যথা।
আপন কেহ নাই—জানি না থাকে যদি,
চিনিতে দেয় নাক মাঝেতে মহানদী।
কেবলি ঝরে বারি কেবলি বহে শ্বাস,
কেবলি দুখ-গান এমনি বার মাস।
এমনি দিন রাত কাটিছে কেঁদে কেঁদে,
বল মা কত আর রাখিবি হেথা বেঁধে!
সহে না এত আর কঠোর এত এরা,
দুখের নাগপাশে জীবন এত ঘেরা।
এতই বিভীষিকা এতই হা হুতাশ,
এতই ভ্রুকুটি অপ্রেম উপহাস।
এতই পরভাব এতই ছাড়াছাড়ি,
তুচ্ছ কথা নিয়ে এতই বাড়াবাড়ি।
তুচ্ছ ধন-আশে এতই উনমাদ,
তুচ্ছ ধন নিয়ে এতই দুরবাদ!
তুচ্ছ যার আশা তুচ্ছ তার প্রাণ,
সহে না আর মাগো প্রাণের অপমান।

---

of their own family except from behind a curtain, that they do not read, and if they did, there is no book in their languages which can give them the smallest instruction on political affairs; the example they afford of the natural capacity of woman for government is striking."—*Subjection of Women.* By J. S. MILL, page 103.

সহে না অবিচার জীবন্ অপচয়,
কথারি কোলাহল কাজে ত কিছু নয়।
যেখানে যাব ভাবি সে পথ নাহি পাই,
আলোর আশা ক'রে অাঁধারে ডুবে যাই।
নে না মা কোলে তুলে দিন ত ব'য়ে গেল,
প্রাণের চারিধারে অাঁধার ঘিরে এল।
হাসি ত ডুবে এল ভাঙ্গিল ধূলাখেলা,
কেবলি মিছামিছি কেটেছি সারাবেলা।
মিছা এ দেহ ব'য়ে কেবলি ঘুরে মরি,
ধাধার বাধা প্রাণ আধার পরিহরি।
বেধো না বাঁধা প্রাণে বাঁধন সয় কত?
শরীর দুরবল অবশ গতিহত।
বাসনা জাগে শুধু জীবন করি জয়,
তোমাতে জনমি মা তোমাতে হই লয়।
তোমাতে মিশে গিয়ে তোমারি কাজ করি,
মিছা এ বাধা প্রাণে অাঁধারে ঘুরে মরি।
প্রাণ ত সঙ্কোপ অাঁধার কারাগারে,
রহিতে নারে আর বদ্ধ চারি ধারে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

সিপাহিযুদ্ধের সময় যখন সকলে আপন আপন সম্পত্তি রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, ভয়ঙ্কর বিপ্লবে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যখন সকলে আপনাদের বহুমূল্য দ্রব্যাদি নির্জ্জন স্থানে গোপনে রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তখন একটি দরিদ্রা মহিলা এ বিষয়ে যেরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়, তাহা সুনীতি, সদভিপ্রায় ও সাধু চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সেই দুঃসময়ে যখন

সকলেই আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল, তখন বিশ্বাসিনী বামনী পরের বিষয়ের জন্য যত্নবতী হইয়া উঠেন।

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তারের পরিচারিকা। সিপাহিযুদ্ধের সময় ডাক্তার অযোধ্যাস্থিত সৈনিক নিবাসে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা নিশীথ সময়ে সংবাদ আসিল অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটী শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে শকটারোহণে লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাইয়া তিনটি সন্তানের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ডাক্তার অপরাপর ইঙ্গরেজেরা যেখানে সজ্জিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অগ্নিশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। চিকিৎসক-রমণী এই ভয়ঙ্কর সময়ে তিনটি শিশু সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে রাজপথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না। অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ দিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভু-পত্নী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন তাহা সে জানিত। এখন কালবিলম্ব না করিয়া সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণরাশি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার গৃহ করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণ গুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনী আপনার জীবিতকাল মধ্যে কথনই উপার্জ্জন করিতে

পারিত না ; কিন্তু প্রভুপরায়ণা বিশ্বস্তা অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অনায়াসে লোভ সংবরণ করিয়া প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে একটি সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাসগৃহ ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া এক খানি ফ্লানেলের কাপড়ে অলঙ্কার গুলি জড়াইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। সে কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই ; সুতরাং তাহাদিগের নিকট ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় প্রকাশ করিল না। এক বৎসরের অধিক কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল, এক বৎসরের অধিক কাল চিকিৎসক পত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনস্থাপিত হইল এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিতা হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনানিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল এবং প্রভু ও প্রভুপত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। যখন আর কোনও সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া আসিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল ও নীরবে সাবধানে তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বামনী অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন তাঁহারা দেখিলেন বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমুদায় অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন অলঙ্কারাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে তাহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী এই রূপে প্রভুপরিবারের বিশ্বাসভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

যখন সিপাহিরা কানপুর অবরোধ করে, তখন একটি নীচজাতীয় দরিদ্রা হিন্দু রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের পিতা মাতা উভয়েই অবরোধের সময় নিহত হইয়াছিল। এই দরিদ্রা নারীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল। দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটিকে তাহার জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং সে তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃমাতৃহীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে কানপুরের অবরোধকার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সিপাহিদিগকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া জুন মাসের শেষে ইঙ্গরেজ সেনাপতি এই নিয়মে নানা সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যগণ নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে, সিপাহিরা তাহাদের কোনও বিঘ্ন জন্মাইবে না। নানা সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনীগণ বিমুক্তির সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রীও সজ্জিত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীকূলে গমন করিল। সকলেই নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, এমন সময় সিপাহিরা তটদেশ হইতে আরোহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। দুইটি কামান নদীতটে লুক্কায়িত ছিল, এখন উহা বাহির করিয়া নৌকার সম্মুখবর্ত্তী করা হইল। ধাত্রী উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষস্থলে চাপিয়া রাখিয়া পুত্রের সহিত সিঁড়িতে নামিল এবং ঐ সিঁড়ি দিয়া সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহিদিগের কলরবমধ্যে অসহায়া রমণী দুইটি সন্তান লইয়া তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহিগণ নিষ্কোশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ফিরিঙ্গী সন্তানকে ধরিবার জন্য

বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না। নিজের অঙ্গাচ্ছাদন মধ্যে তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া বাহুদেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

নরহন্তা সিপাহি অসি আস্ফালন করিয়া তীব্রভাবে কহিল—"বালকটিকে হাতে দাও, তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী নারী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না, ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই" সিপাহি সরোষে ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল—"মা, শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায়ও দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না। নির্ভয়ে অটল সাহসে উত্তর করিল—"না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল, আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা পিতৃমাতৃহীন শিশুর জন্য নীরবে ধীরভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহি ফিরিঙ্গী শিশুটিকে বধ করিল। কেবল একমাত্র ধাত্রীর পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল, সিপাহি তাহার উপর কোনও অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উপস্থিত হইলে সে কহিত—"মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া উভয়েই হত হইলেন।"

১৮৫৭ অব্দের ৩রা জুলাই রাত্রিতে ১৭ গণিত ভারতীয় পদাতিকসৈন্য গোরক্ষপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আজিমগড়ের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারা যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া একজন ইঙ্গরেজ আফিসরকে হত্যা করে, আজিমগড়ের জেলের সমুদায় কয়েদীকে খালাস দেয় এবং কালেক্টরী হইতে সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া অযোধ্যার অভিমুখে যাইতে থাকে। পথেও ইহারা অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে নিরস্ত হয় নাই। ৪ঠা জুলাই রাত্রি ১১টার সময় কতিপয় ইউরোপীয় পুরুষ ও স্ত্রী ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণবার্ত্তা তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের আর ভোজন হইল না, তাঁহারা টেবিলের দ্রব্যাদি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে লাগিলেন। তিনটী ছোট বস্তায় কতকগুলি কাপড় ছিল, অসময়ে ঐ কাপড়গুলি তাঁহাদের অনেক কাজে লাগিতে পারিত, কিন্তু ব্যস্ত সমস্ত হওয়ায় তাঁহারা ঐ গুলিও লইয়া যাইতে পারিলেন না।

এই সঙ্কটকালে বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা উক্ত পলাতক ইউরোপীয়দিগের উপকারে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা পলাতকদিগের চারিপার্শ্বে থাকিয়া সকলকে নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে আনয়ন করে। ইউরোপীয়েরা এই খানে তাঁহাদের এক দল খিদ্‌মদ্‌গারের আলয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই স্থানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্যে তাঁহারা মোহিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেছে। এক কি দুই ঘণ্টার পর তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য আর একটি গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই খানি খাটিয়া ও পানের জন্য এক ঘড়া জল দেওয়া হইল। তিন দিন ও দুই রাত্রি বিপন্ন ইউরোপীয়েরা ঐ আশ্রয়স্থানে নিরাপদে অবস্থিতি করেন। বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা এই খানে তাঁহাদিগকে চপাটি দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে বিমুখ হয় নাই। তাঁহাদের আবাসগৃহ বিলুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছিল।

গৃহস্থিত দ্রব্যাদি আক্রমণকারীদিগের হস্তগত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরোপকারী ভারতবাসীর দয়া ও সৌজন্যে

তাঁহাদিগের জীবন সংশয়াপন্ন হয় নাই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হৃদয়ভেদী দুঃসংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহারা মৃত্যুর বিকট রূপ আগতপ্রায় বলিয়া মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ বিপদাপন্ন হইলেও দয়ার কোমল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহারা যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই স্থানের অতি নিকটে কতকগুলা বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলির নীচে আক্রমণকারীরা একটি টাকার বাক্স লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পলাতকেরা আপনাদের নিকটে ঐ সমস্ত কালান্তক যম দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। এ সময়ও, দয়াপর ভারতবাসীরা আপনাদিগকে বিপন্ন বোধ করিলেও, ইউরোপীয়-দিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিপন্নদিগের পলায়নের দুই দিন পরে হঠাৎ একদা প্রাতঃকালে জনরব উঠিল যে, পলাতকেরা মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে। উপস্থিত জনরবে পলাতকগণ হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু এ সময়েও তাঁহাদের জীবনের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। একজন হিন্দু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে আর একটি পল্লীতে আনিয়া রক্ষা করেন। রক্ষাকারীর পরামর্শে ইউরোপীয়গণ আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। ইহা একটি রাজপুত-পল্লী, বহুসংখ্যক রাজপুত এই পল্লীতে অবস্থিতি করিতেন। আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করা রাজপুতের চিরন্তন ধর্ম্ম। উপস্থিত সময়ে রাজপুতেরা এই চিরন্তন ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। এই পল্লীর ২০০০ দুই হাজার রাজপুত উন্মত্ত মুসলমানদিগের করাল আক্রমণ হইতে বিপন্ন অসহায় ইউরোপীয়-দিগকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইউরোপীয়েরা ১৪ দিন এই খানে অবস্থিতি করেন। যে সকল ঘরে গরু রাখা হইত, ইউরোপীয়েরা সেই সকল ঘরে লুকাইয়া থাকিতেন। অবশেষে তাঁহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হয়। ১৪ দিন পরে বারাণসীর কমিশনর তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য কতক-গুলি হস্তী, ২২ জন দেহরক্ষক অশ্বারোহী ও কতিপয় পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দেন। বিপন্নগণ হাতীতে চড়িয়া ঐ সকল সৈন্যের সহিত নিরাপদ স্থানে উপনীত হন।

দিল্লীতে যখন যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদিগের পরাক্রমে ইউরোপীয়দিগের পরা-

জয় হয়, তখন ইউরোপীয়েরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকেন। এই সঙ্কটকালে ইঁহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। ইঁহারা কিরূপে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিরূপে ভগ্ন বাড়ী প্রভৃতি আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিরূপে নানা সঙ্কটপূর্ণ স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম মাথায় লইয়াছিলেন, ইঁহাদের কোমলাঙ্গী কুলনারীগণ আপনাদের স্বামিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং ইঁহাদের কোমলপ্রাণ শিশুসন্তান সকল পিতা মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কিরূপ যাতনা ভোগ করিয়াছিল, তাহা অনেকে নিদারুণ অনুশোচনার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। পলাতকগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কেহ কেহ মিরাটে, কেহ কেহ কর্ণালে ও কেহ কেহ বা অম্বালায় যাইয়া উপস্থিত হন। পথিমধ্যে পল্লীবাসিগণ ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিল। পল্লীবাসীদিগের সাহায্য না পাইলে, বোধ হয়, কেহই আপনাদের প্রাণ লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পহুঁছিতে পারিতেন না।

৩৮ গণিত সিপাহিদলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার (ইনি লেপ্টেন্যাণ্ট পিলি নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর স্ত্রীর) সহিত ঐ সময়ে পলায়ন করেন। ডাক্তার উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল, ঐ আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার এই অবস্থায় মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য খাটিয়া দেয় এবং আপনাদের কুটীরে লুকাইয়া রাখে। বাগান রক্ষকগণ তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে কোনও রূপ ত্রুটি করে নাই। রাত্রি ৩টার সময় ইঁহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাদিগকে খাইবার জন্য দুগ্ধ রুটি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। একজন প্রাচীন হিন্দু এই পল্লীর মোড়ল ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিরা আসিয়া পাছে ইঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় গ্রামাধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন এবং গোশালা হইতে গরু গুলি বাহির করিয়া লন।

পলাতকেরা ঐ স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইঁহাদিগকে নীরবে থাকিতে কহে, যেহেতু কয়েকজন সিপাহি তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইঁহারা প্রথমে ভাবিলেন মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে, কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথা ঠিক হইল। ইঁহারা যেখানে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই খানেই এক জন সিপাহি আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহি আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গাড়ী ও গরু লইতে আসিয়াছিল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহিকে গরু ও গাড়ী দিলেন, সিপাহি অভীষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহিকে গ্রাম হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার ইচ্ছা করিয়াই, তাহার আবশ্যক গরু ও গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে সিপাহি গ্রামে কিছুক্ষণ থাকিলে বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সন্ধান পাইবে। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী এইরূপে বর্ষীয়ান্ গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময় গ্রামের লোকে ইঁহাদিগকে আহারের জন্য কয়েক খানি রুটি এবং পানের জন্য পাত্র ভরিয়া জল দিলেন। ইঁহারা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইঁহাদের সঙ্গে কিছু দূর যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৪ টার সময় ইঁহারা আর একটি গ্রামে আসিয়া পহুছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ আপনাদের কার্য্যে যাইতে লাগিল। ইহা একটি হিন্দু পল্লী। একজন প্রাচীন হিন্দু পলাতকগণকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া আপনাদের গ্রামে লইয়া আইসেন এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইঁহাদিগকে সন্তুপ্ত করেন। ডাক্তারের আহত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য এই দয়াপর আশ্রয়দাতা জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। নিকটবর্ত্তী আর একটি পল্লীতে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি, বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে আইসেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে ডাক্তার উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এজন্য ডাক্তার

দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাক্তারকে কাঠের নল দ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে কহেন এবং এই জন্য নিজে একটি কাঠের নল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দেন। দয়ালু ব্রাহ্মণের সংপরামর্শে ডাক্তার উডের অনেক উপকার হয়। ডাক্তার উড্ নলদ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা এই রূপে প্রাচীন পল্লীবাসীর আশ্রয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সিপাহিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে, এই জন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তার উড্ প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে কহেন। আশ্রিত ইঙ্গরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উক্ত আশ্রয়দাতার অভিপ্রেত ছিল না। আশ্রয়দাতা উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশেই আশ্রিত দিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন। এই সময় প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতেছিল, উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজ মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তারকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। এই বিপত্তিকালে গ্রামের আর এক ব্যক্তি ইহাঁদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া আইসে এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ইঁহাদিগকে ঘুমাইতে কহে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড সূর্য্য অনলকণা বিকীর্ণ করিতেছিল, তখন বিপত্তিগ্রস্ত পলাতকগণ দরিদ্র পল্লীবাসীর অসীম করুণায় ও অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে বেলা শেষ হইল। রাত্রি সমাগত হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ অল্পতর করিয়া তুলিল। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী আপনাদিগের আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ দিন হইল, ইঁহারা দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি দশ মাইলের অধিক আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা ২ টার সময় ইঁহারা আর একটি পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের অধিবাসিগণ ইঁহাদিগের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। উপস্থিত সময়ে বিপন্নদিগের প্রতি যত-দূর-সম্ভব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর হয় নাই। পলায়িতেরা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা অবি-

কারচিত্তে ও সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ইহাদের প্রদত্ত শীতল জলে পলায়িতদিগের তৃষ্ণা শান্তি হয়। ডাক্তারের মুখ ধৌত করার জন্য ইঙ্গরেজ কুলনারীগণ একটি পাত্র চাহেন, পল্লীবাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা ইঁহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাক শবজীতে ভাল তরকারি রাঁধিয়া আনে। ইঙ্গরেজমহিলাদ্বয়ের একটি কহিয়াছেন যে, দিল্লী পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য আর তাঁহারা কখনও আহার করেন নাই। পল্লীবাসিনীগণ এই রূপে বিপন্নদিগকে আহার ও পানীয় দিয়া সন্তৃপ্ত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড় নামক আর এক খানি গ্রামে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রাণী এইস্থানে কর্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রাণী বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্নদিগের আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইল। ডাক্তার উড্ ও তাঁহার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয় রাণীর এইরূপ অনুগ্রহে আহার পানে পরিতুষ্ট হইয়া সে রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্সন নামক একজন সৈনিকপুরুষ অতর্কিত ভাবে বলগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্টেনেণ্ট পিলিও আর একদিক হইতে সেই স্থানে পহুঁছিলেন। পিলি আপনার সহধর্ম্মিণীকে অক্ষতশরীর দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। সকলে এখন আশান্বিত হৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার উডের চলিবার শক্তি ছিল না। গুরুতর আঘাতে ডাক্তার উড বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েক জন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার এক শেষ দেখায়। ইহারা চলৎশক্তিহীন ইঙ্গরেজ চিকিৎসককে বহন করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে উন্মত্ত সিপাহিদিগের কোপে পতিত হইতে হইবে তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এই রূপে দরিদ্র গ্রামবাসীদের অসীম

দয়ায় নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে কর্ণালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইহাঁদের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থ ৪০ জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষেরা ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্ণালে পহুঁছাইয়া দেয়।

উপস্থিত সময়ে, দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহের পত্নী পরমসুন্দরী জেন্নত মহলের উপর ইঙ্গরেজগণ বড় বিরক্ত ছিলেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানা রূপে অসন্তুষ্ট করিতেও ত্রুটি করেন নাই। দিল্লীর গোল-যোগের সময় জেন্নত মহল প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখেন। তিনি লুক্কায়িত ইউরোপীয়দিগের প্রাণরক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়া-ছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ বিপন্নগণ আশ্রয়দাত্রী জেন্নত মহলের করুণায় নিরাপদ থাকেন। ইঙ্গরেজের বিচারে শেষে এই জেন্নত মহলকে বৃদ্ধ বাহাদুরের সহিত রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে দিল্লী হইতে যাঁহারা পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৪ গণিত সিপাহিদলের ডাক্তার ওয়াট্‌সন নামক একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ডাক্তারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। একজন সন্ন্যাসী ডাক্তারের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে দাদুপন্থী যোগীর বেশে সজ্জিত করেন। উক্ত যোগী তাঁহার কাপড় রং করিয়া দেন এবং তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা সমর্পণ করেন। দয়াশীল সন্ন্যাসী বিপন্ন ডাক্তারের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্নবেশ পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তার এইরূপ সন্ন্যাসীর বেশে ২৫ দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে, কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী বেশধারী ওয়াট্‌সনকে দেখিয়া কহেন—"আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, আপনার কটা চক্ষুই আপনাকে ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত করিতেছে। আপনি নিশ্চিতই ফিরিঙ্গি।" কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডাক্তারকে ইঙ্গরেজ বলিয়া চিনিতে পারিলেও, তাঁহার সহিত কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

আর একটি প্রচীন লোক একটি অসহায়া ইঙ্গরেজ মহিলা ও তাঁহার

সন্তানকে অনেক দিন রক্ষা করে। আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে, সিপাহিদিগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায় এবং অপরের অগোচরে গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখে। ইহাদের আশ্রয় স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তখনই বৃদ্ধ আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছে। মিরাটের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"দিল্লী হইতে যাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক লোকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউরোপীয় শিশু সন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আইসে। তাহাকে পরিতোষিক দিতে চাহিলে সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহে যে, যদি কোনও পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহার নামে একটী কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই।"

পলাতকদিগের মধ্যে কাপ্তেন হল্যাণ্ড নামক এক জন সৈনিক পুরুষ কহিয়াছেন—"আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সে গ্রামে দুধ না পাওয়াতে পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার ও তাহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন "আমি যমুনাদাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ৬ দিন থাকি। বাড়ীর যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেন এবং তিনি যত ভাল খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করেন।"

এক জন ইঙ্গরেজ ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত চাপরাসি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের একজন দিল্লীর আজমীরতোরণ অতিক্রম সময়ে উত্তেজিত লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হয়, অপর জন ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আইসে।

যে সকল ইঙ্গরেজ মিরটের পরিবর্ত্তে অম্বালার অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কর্ণালের নবাবের সদাশয়তায় বিশেষ

উপকৃত হন। দিল্লীর জজ্ বস্ সাহেব কর্ণালে আসিলে নবাব তাঁহাকে কহেন—"উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ এখন সমস্তই আপনাদের জন্য অর্পিত হইতেছে।" নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যের জন্য তিনি পঞ্জাবী পুলিস সৈন্যের অনুকরণে ১০০শত অশ্বারোহী সেনা প্রস্তুত করেন। দিল্লীর গোলযোগের সময়ে এইরূপে অনেকেই ইঙ্গরেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়, নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ভূস্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের উদ্ধার সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের আবাসপল্লী, অধিক কি আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ দয়া ও এইরূপ সদাশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায় নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজগণ কখনও নিরাপদ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন না। যখন ইঙ্গরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান ও কোমলাঙ্গী মহিলাগণকে লইয়া ইতস্তত পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া রুধিরাক্ত শরীরে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাড়ী পাল্‌কী সমস্তই ফেলিয়া কখনও বিজন জঙ্গলে, কখনও সঙ্কীর্ণ লোকালয়ে, কখনও বা অপরিষ্কৃত গহ্বরে আত্মগোপন করেন, এবং প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে করুণা প্রার্থণা করেন, তখন ঐ সকল সদাশয় ভূস্বামী এবং ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক ইঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে, ইঁহারা নিঃসন্দেহ দুর্গম পথপ্রান্তে বা নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। (ক্রমশঃ।)

কালিদাসের উপমা।

গিরিপত্নী মেনা সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার সংযোগে সাতিশয় শোভাময়ী হইলেন।

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দা
দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলবিশিষ্টা সেই দুহিতা কর্ত্তৃক জনয়িত্রী (মেনা), নবমেঘশব্দে বিকাশপ্রাপ্তা, রত্নশলাকা কর্ত্তৃক শোভিতা পর্ব্বতের প্রান্তভূমির ন্যায়, অতিশয় শোভিতা হইলেন।

কন্যাটী দিন দিন বাড়িতে লাগিল—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥

উদিতা এবং পরিবর্দ্ধমানা চন্দ্রলেখা যেমন জ্যোৎস্নায় অন্তর্ধানশীল কান্তিমান কলাসমূহে দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে সেই রূপ উৎপন্না এবং পরিবর্দ্ধনশীলা সেই বালা কান্তিবিশিষ্ট অবয়বসমূহে পুষ্ট হইতে লাগিল।

কন্যাটীর উপর গিরিরাজের বড়ই মায়া জন্মিল।

মহীভৃতঃ পুত্রবতোপি দৃষ্টি
স্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হিচূতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা॥

অনেক পুত্র কন্যা থাকিলেও হিমাদ্রির চক্ষু সেই অপত্যে (উমায়) তৃপ্তিলাভ করিত না, (উমাকে দেখিয়া আশ মিটিত না)। বসন্তে নানাবিধ কুসুম সত্ত্বেও ভ্রমরশ্রেণী চূতকুসুমেই বিশেষ রূপে সঙ্গত হয়।

প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপ
স্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী
তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥

মহতী প্রভাযুক্ত শিখা কর্ত্তৃক দীপের ন্যায়, ত্রিপথগা মন্দাকিনী কর্ত্তৃক স্বর্গের পথের ন্যায়, বিশুদ্ধ বচন কর্ত্তৃক বিদ্বানের ন্যায় সেই কন্যা কর্ত্তৃক হিমালয় পবিত্র এবং বিভূষিতও হইয়াছিলেন।

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাম্
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।

পার্ব্বতীর চরণদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে সংন্যস্ত হওয়ায় অভ্যুন্নত অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয়ের নখপ্রভাচ্ছলে উহাদের অন্তর্নিহিত চিরলৌহিত্য বাহিরে নিঃসরণ করিতে করিতেই যেন পৃথিবীতে সঞ্চারিণী স্থলকমলিনীর শোভা আহরণ করিত।

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশ লুব্ধৈ-
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥

সেই সন্নতাঙ্গী উমা বোধ হয় নূপুরশিঞ্জিত শিক্ষার জন্য প্রত্যুপদেশ-প্রার্থী রাজহংসগণের নিকট বিলাস বিশিষ্ট পাদবিন্যাসযুক্ত গমন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব
প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥

সেই মধুরভাষিণী উমা যখন অমৃতস্রাবী স্বরে কথা কহিতেন, তখন কোকিলার শব্দও বেসুরা বীণার মত লোকের শ্রুতিকঠোর বোধ হইত।

সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না-
দেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥

এক স্থানে সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখাইবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা যথাক্রম স্থাপিত সমস্ত উপমাদ্রব্যের সমষ্টির দ্বারা উমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারকাসুর পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট দুঃখ করিতেছেন—

তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহত ক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্তৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে॥

সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধ সমূহের ন্যায় সেই ক্রূর অসুর সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত উপায়ের বিফল প্রয়োগ হইতেছে।

ব্রহ্মা বলিলেন—

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নৈত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

আমা হইতেই সেই দৈত্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, অতএব আবার আমা হইতেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সম্যক রূপে বর্দ্ধিত করিয়া বিষবৃক্ষকেও স্বয়ং ছেদন করা যায় না।

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ॥

সেই (কার্য্যার্থী) তোমরা অয়স্কান্ত মণির দ্বারা লৌহের ন্যায় উমার সৌন্দর্য্যের দ্বারা মহাদেবের সমাধিনিশ্চল মনকে আকর্ষণ করিতে যত্নবান হও।

এই কঠিন কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য দেবরাজ মদনকে স্মরণ করিলেন—

অথ স ললিতযোষিদ্ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গম্
রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥

অনন্তর মদন রতির কঙ্কণচিহ্নযুক্ত স্বীয় কণ্ঠে সুন্দরী রমণীগণের ভ্রূলতার সদৃশ মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট ধনু আরোপিত করিয়া, সহচর বসন্তের হস্তে চূতাঙ্কুরাস্ত্র স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রের নিকট আগমন করিল।

ইন্দ্র মদনকে বলিলেন, উৎকট শত্রুপীড়িত দেবগণ মহাদেব হইতে একজন সেনাপতির উৎপত্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সংযমিশ্রেষ্ঠ শম্ভু এখন হিমালয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত। তাঁহাকে সমাধি হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। তোমার পুষ্পধনু একা এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। নগেন্দ্র-কন্যা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সুকেশী উমা পিতার আদেশক্রমে নিত্যই তপস্বী গিরিশের শুশ্রূষা করিতে আইসে—আমার গুপ্তচর অপ্‌সরাগণের মুখে শুনিয়াছে।

তদ্গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্য্য
মর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
অপেক্ষ্যতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাম্
বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ॥

অতএব কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। দেবতাদের কার্য্য কর। এই কার্য্য কারণান্তরসাপেক্ষ; তথাপি বীজসাধ্য অঙ্কুর তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে বারির ন্যায়, চরমকারণস্বরূপ তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্য্যা-
দসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণশ্চোদয়িতা ভবেতি
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য॥

হে মন্মথ! বসন্ত তোমার সহচর; অতএব অনুরোধ না করিলেও সে তোমার সহায় হইবে। হুতাশনের সাহায্য করিতে সমীরণকে কে আদেশ করে বল?

হিমালয়ে আসিয়া মদন তপশ্চারী মহাদেবকে দেখিল—

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়-
মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংশম্।

উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ

প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥

বীরাসনবন্ধ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ নিশ্চল; তিনি ঋজু এবং আয়ত; তাঁহার অংশদ্বয় সন্নমিত। উর্দ্ধতল পাণিদ্বয়ের সংস্থান হইতে যেন অঙ্কমধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই সংযমিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া কামের শর এবং শরাসন হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে উমা সেই খানে উপস্থিত হইলেন।

নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যম্

সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।

অনুপ্রযাতা বনদেবতাভ্যা

মদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥

মদনের নষ্টপ্রায় বীর্য্যকে শরীরের সৌন্দর্য্যের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে করিতেই যেন, সখীভূতা বনদেবতাদ্বয় কর্ত্তৃক অনুযাতা পর্ব্বতরাজদুহিতা পার্ব্বতী দেখা দিলেন।

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-

মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।

মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম্

বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥

উমা বসন্তপুষ্পের আভরণধারিণী—অশোক কুসুম পদ্মরাগের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে, কর্ণিকারপুষ্প স্বর্ণাভরণের বর্ণ আহরণ করিতেছে, এবং সিন্ধুবারকুসুমসমূহ মুক্তাকলাপের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য

পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।

উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ

শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥

কামও বাণসন্ধানের অবসর বুঝিয়া, হুতাশনে প্রবেশেচ্ছু পতঙ্গের ন্যায় উমার সমক্ষে হরে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া শরাসনের মৌর্ব্বী বারম্বার আমর্শন করিতে লাগিল।

বসন্তকে দেখিয়া রতির মদনবিয়োগদুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশম্
স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥

মধুকে দেখিয়া রতি অতিশয় কাঁদিতে লাগিল এবং স্তনদ্বয় পীড়িত করিয়া স্বীয় বক্ষস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। আত্মীয় জনের নিকট দুঃখ যেন মুক্তদ্বার হইয়া উঠে।

মদন পুনর্জ্জীবিত হইবে, অতএব শরীর রক্ষা করিতে মরণনিশ্চয়া রতির প্রতি আকাশবাণী হইল।

তদিদং পরিরক্ষ শোভনে
ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমং বপুঃ।
রবিপীতজলা তপাত্যয়ে
পুণরোঘেন হি যুজ্যতে নদী॥

অতএব হে সুন্দরি,—এই শরীর রক্ষা কর, ইহার প্রিয়সঙ্গম পুনর্ব্বার ঘটিবে। রবি কর্ত্তৃক একবার জল পীত হইলে নদী পুনরায় বর্ষাকালে প্রবাহের সহিত যুক্ত হয়।

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তম্
ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা
কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্।

অনন্তর রজনীর আশায় কিরণক্ষয়মলিনা দিবসভবা চন্দ্রলেখার ন্যায় দুঃখক্লিষ্টা রতি বিপদের অবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মেনা অনেক বুঝাইয়াও উমাকে তপস্যার ইচ্ছা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না।

ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাম্
শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥

এইরূপ নানা উপদেশ দিয়াও মেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞা তনয়াকে তাহার উদ্যম হইতে নিবারিত করিতে পারিলেন না। ইষ্ট বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনকে এবং নিম্নমুখাভিগামী পয়ঃপ্রবাহকে কে প্রতিবর্ত্তিত করিতে পারে?

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতম্
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥

ব্রতচারিণী উমা ব্রতাবসানে গ্রহণ করিবার মানসে দুইটী বস্তু দুইটী স্থানে এখন রাখিয়া দিয়াছেন—লতাসমূহে বিলাসবিভ্রম এবং হরিণীগণের নয়নে বিলোল দৃষ্টি।

এইরূপ রঘুতে—

কলমন্যভৃতাসু ভাষিতম্
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতম্
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥

কোকিলায় মধুর বাক্য, কলহংসীতে মন্থর গমন, হরিণীতে বিলোলদৃষ্টি এবং অনিলকর্ত্তৃক ঈষৎ কম্পিত লতায় বিলাস।

মেঘদূতে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম
বক্তু চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

প্রিয়ঙ্গু লতায় তোমার অঙ্গসাদৃশ্য, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার বিলোল-দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার বদনচ্ছায়া, শিখিগণের পুচ্ছভারে তোমার কেশানুকৃতি এবং স্বল্পবিক্ষোভিত নদীর তরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাসভঙ্গী আছে মনে করিয়া দেখি; কিন্তু দুঃখের বিষয় একটী বস্তুতেও তোমার সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা
তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতম্
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ॥

কন্দুকক্রীড়াতেও যে উমার ক্লান্তি বোধ হইত, সেই উমা এখন মুনিগণের কঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। নিশ্চিত বোধ হয়, তাঁহার শরীর, সুবর্ণকমল গঠিত—কমলের ন্যায় সুকুমার, অথচ স্বর্ণের ন্যায় সারবান।

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পদাম্
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্॥

শীত কালের রাত্রে কমলসুরভি ও কম্পমান অধরপত্রশোভী মুখের দ্বারা উপলক্ষিতা সেই উমা তুহিনবর্ষণে নষ্টপদ্ম জলাশয়ের সরোজসমষ্টি বলিয়া অনুমিতা হইতেন।

তুষারপাতে জলাশয়ের অন্যান্য সমস্ত পদ্ম ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। উমার মুখপদ্ম সচ্ছন্দে তুষারবর্ষণ সহ্য করিত—অধরপত্র কম্পিত হইত মাত্র।

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥

অনন্তর মৃগচর্ম্ম ও পলাশদণ্ডধারী, ব্রহ্মময় তেজে জাজ্বল্যমান এবং মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় একজন জটাবান ব্রহ্মচারী উমার তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

শান্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরে রাধানাথ বাবুর রাজপ্রাসাদসদৃশ সুবিস্তৃত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কৌচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মর প্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল, আলমায়রা ইত্যাদি। আলমায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থভারে প্রপীড়িত; যেন রত্ন ব্যবসায়ীর বিপণি। ভিত্তি গাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। এই বহ্বায়ত প্রকোষ্ঠ ভবনের যে ভাগে সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে, পুরমহিলারাও, অপর লোকের অলক্ষিত ভাবে, তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়।

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ একতম কৌচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর। যে সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্ম জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন; যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদকেও বিপদ বলিয়া মনে করেন না; যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানবমনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানব হৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর

ফটোগ্রাফ নহে। সুকুমারী সর্ব্ব সমক্ষে বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাস তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র কাহার? তাহাও কি ছাই আমার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী-শিরোমণি, রাধানাথ-তনয়া সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি, আজ তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয় তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া আজি একবার আইস। দেখ তোমার যিনি গুরুর গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুবোধেও তোমাছাড়া হইয়া জীবনের অন্য গতি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতিবিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়নসম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কবিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে সেই গৃহমধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে, না জানি, তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহাব পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা, এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?"

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিয়া আসিলেন। আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্নিচর্ব্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন, সুরবালা, আমি তোমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইব? না দেবি, তোমার আমার হইয়া কাজ নাই।"

রমাপতি চিত্র ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু সুরবালা, আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। একদিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দন কাননের ন্যায় আনন্দধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয়ে এক দেবীর রাজসিংহাসন ছিল; কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি, সুকুমারি তুমি আজি কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে আজি আমার জীবন শুষ্ক, আজি আমি অভাগা। আইস আমার দেবী, আইস করুণাময়ী, আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমাছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দেও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটী দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্নালঙ্কার বিভূষিতা, সমুজ্জ্বলস্বর্ণসূত্রবিনির্ম্মিত বসনাবৃতা পরম শোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অলঙ্কারশিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া রমাপতি ব্যস্ততাসহ সেই প্রতিকৃতি

প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"একি! একি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ নাকি?"

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—

"যাও দেবি, যাও সুরবালা, আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস, মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

সুরবালা রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি, তবে ইহজগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা. তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ। যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।"

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি, তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের কি প্রতিশোধ আমি দিতে পারি? আমার আছে কি?"

সুরবালা তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—

"তুমি আমাকে আর কি দিবে তাহা আমি জানি না। তোমার কিছু আছে কি না তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এই মাত্র জানি তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়ায় যে কত সুখ তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু তাহা না বলিয়াও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও

আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা, আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।”

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুরবালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—

“সুরবালা, তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে; তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা, তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই আমি লুকাইব না। সুরবালা, আমি বড়ই অভাগা, কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ের এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজি নাই। আজি দুই বৎসর হইল আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা দীনহীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা, তুমি স্বর্গের দেবতা। আমি তোমাকে লইয়া কোথায় রাখিব? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলিতেছি দেবি, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।”

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—

“তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন্ ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।”

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

“আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি, সুরবালা, সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশা সাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—

ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই এখন আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনে মায়া। তোমাকে পাইলে আমার দগ্ধ জীবন পুনর্জীবিত হইবে; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে?"

সুরবালা উত্তর দিলেন—

"আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি তাহা হইলেই আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না। তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।"

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"ধন্য এ জীবন। সুরবালা, যে অভাগা ছিল, সে আজি তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান। এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহ, এত ধূমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কখন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোচ্ছ্বাসময় হইল। প্রায় লক্ষ মুদ্রা এই বিবাহকাণ্ডে ব্যয়িত হইল এবং সমস্ত নগর এক পক্ষ কাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব দম্পতীর পুষ্পবাসর হইবে তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য স্ফাটিক আধারে আলোকমালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ গন্ধময় পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দররূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালাসমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন সমূহে পুষ্পের যবনিকা সমূহ বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্বপাত্রে সুদৃশ্য পুষ্পগুচ্ছসমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময় পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণসূত্রসমন্বিত শয্যা, তাহার আস্তরণপ্রান্তে

মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণসমাচ্ছন্নকায়া সুরবালা এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য লীলার রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে করিত সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জনে তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে; সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য সম্বেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরীলীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত, সুকঠিন, শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এক কালে মকর কুম্ভীরাদি জীবের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ তরক্ষু ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশী দশা পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান রমাপতি আজি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রমানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরীকুলকমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিনী, রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে, সুকুমারী, তুমি কোথায়? দেখ তোমার সেই রমাপতির আজি একি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ তোমার সেই চিরাধিকৃত স্থানে আজি আর এক নবীনা বিরাজ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতী এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের বিবাহই অসিদ্ধ। দম্পতী নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, আশার আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালে যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ক্রটী হয় নাই।

তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতেছিল, তাহা এখন অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষী-কূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয় এখন তাহাই হইতেছে। গৃহ-মধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল।

তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এ সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজি আমি কাহার জিনিষ কাহাকে দিলাম? ইহাতে কি আমি সুখী হইব?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সুখী হইব যে তাহার আর সন্দেহ কি? আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম। সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল ইহ জগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এত রূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে আমার!" আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? সে সুকুমারী আমার কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই ত প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই অন্ত নাই।" তখন একে একে অমূল্য পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ; বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়; তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল তাঁহার সেই দুরবস্থার কথা। ছিন্ন কন্থা-বিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপাধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কূয়া হইতে কলসী করিয়া জল তুলিতেন; পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন, না করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্যভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার দেহাভরণ করিত মাত্র। আর আজি? আজি যে নবীনা

সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও সে জানে না। সুকুমারীর শত বস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান। দশজন দাসী তাহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার সুখ সম্বিধানে নিযুক্ত। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—আমার সেই সুকুমারী, আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া, এত দেহপাত করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহ জগতে নাই। ইহজগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আমার তো ধ্বংস নাই। তাহার দেহলয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখনই হয় নাই। তবে সুকুমারী, দেবি, তুমি দেখিতেছ কি ঐ স্বর্গধাম, তোমার বাসস্থান ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক!"

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ নিষ্প্রভ আলোকে রমাপতি দেখিলেন যেন গৃহের ভিত্তিতে একটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে আবার মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চীৎকার করিলেন,—

"কে? কে ওখানে?"

কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার নেত্র সম্মুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িল মাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কি কি? ভয় পাইয়াছ নাকি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কই, কই?"

ছায়া এবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া ভিত্তিগাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্ম্যতলসংলগ্ন হইল।

রমাপতি বলিলেন,—

"এই যে! ঐ যায়!"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে এরূপ ছায়াপাত হইতে পারে সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটী সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি 'সুকুমারি, সুকুমারি!' শব্দে চীৎকার করিয়া সেই হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"সুকুমারি, সুকুমারি! এতদিন পরে তোমার আমার কথা মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,

"তুমি কি বলিতেছ? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন,

"তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ তাহা যেমন সত্য আমার সুকুমারীকে দেখাও তেমনই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? সুরবালা, সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী!"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের

একটী দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়াছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না। সকলই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,

"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও হয় ত তাই ভাবিতেছিলে; তাহাতেই হয় ত এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। সেই সরোবরে কোন সময়ে দুইটী বালক বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে লোকে ইহাকে 'মরার পুকুর' নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং পরম্পরাগত স্ত্রীরসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ জন্য সেই পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত, সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু গুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পুষ্করিণীতে লোকজন আসিত না। কিন্তু আজি এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের

মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল কিন্তু কোমলতাবর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনাব্যঞ্জক। যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সংঘর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঘর্ষণেও যে, দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, এ কথা হয় ত যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধবিধানে আপনার শ্যামকায়া ও পরিধানবস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীরসন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল কলস পড়িয়া ছিল তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবার জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বামকক্ষে কলস গ্রহণ করিয়া এবং আপনার পরিধানবস্ত্রের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে অতি সাবধানতার সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় ও মলিন অন্ধকার দেখা দেয়, এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাশঙ্কাবিরহিতা যুবতী অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিম্বদন্তী সকলই উপেক্ষা করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

"কেও, রামলাল? কতক্ষণ?"

পুরুষ বলিল,—

"আধ ঘণ্টারও উপর। বাপরে, এমন গা ধোওয়ার ঘটা কখন দেখি নাই; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল তা আর অমন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই; তোমার পায়ে পড়ি।"

যুবতী বলিল,—

"পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘসা মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা!"

রামলাল বলিল,—

"কালি, এততেও তোমার মন পাইলাম না। হয় ত তোমার পায়ে প্রাণ

না দিলে তুমি বুঝিবে না আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল এবার তাহাই করিয়া দেখাইব।”

যুবতীর নাম কালীমতী, কি কালীতারা, কি কালিদাসী, কি এমনই একটা কিছু হইবে। আমরা তাহার নিগূঢ় সংবাদ জানি না।

কালী বলিল,—

“কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? যে কাজটা চোখ কাণ বুজিয়া একবার সারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের সুখের পথে আর কাঁটা থাকে না, আমাদের আর এমন করিয়া অন্ধকার বনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, তাহার জন্য তোমাকে এতদিন বলিতেছি, তুমি আজিও তাহার উপায় করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেমন করিয়া বলিব তুমি আমার জন্য পাগল? পাগল অনেক দূরের কথা, তুমি যদি আমাকে একটুও ভাল বাসিতে তাহা হইলে কোন্ দিন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে।”

রামলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—

“তুমি বুঝিতেছ না, কালি, কাজটা বড় শক্ত। একটা মানুষ নিকাশ করা আজিকার দিনে সোজা কথা নয়। ঐ শত্রুটাকে সরাইয়া না দিলে যে আমাদের মঙ্গল নাই, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু করি কি বল দেখি?”

কালী নিতান্ত রাগতস্বরে বলিল,—

“করিবে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড! অমি বুঝিয়াছি তুমি কোন কর্ম্মের নও। অমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হইতাম, তাহা হইলে, কোন্ কালে সকল কাজ শেষ করিয়া দিতাম। কি বলিব আমি মেয়ে মানুষ, তাতেই তোমাকে এত সাধাসাধি। বুঝিয়াছি তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না; এখন তোমাকে আমি দেখাইব, তোমার মত পুরুষের চেয়ে মেয়ে মানুষও ঢের ভাল। এ জ্বালা আমার আর সহে না। আমি আজিই এদিক ওদিক যা হয় একটা করিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছি। সকল কাজই আমি করিব, কেবল সময়কালে তুমি একটু সাহায্য করিবে কি না আমি জানিতে চাই। তাও বোধ করি তোমাকে দিয়া হইয়া উঠিবে না—কেমন?”

রামলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—

“তা—তা আর পারিব না? আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি তাই

করিব। বালাইটাকে যেমন করিয়া হউক দূর করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি—বলি এত তাড়াতাড়ি না করিয়া একটু দেরি করিলে চলে না কি ?"

কালী অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল,—

"না, তা চলে না। তুমি ভেড়াকান্ত, তাই এখনও এ কথা বলিতেছ। দেরি—একাজে আবার দেরি ? এখনই যদি সুযোগ হয় তা হলে আমি এখনই কাজ সারিতে রাজি আছি। কিছু দেরি নয়; আজি রাত্রেই আমি যেমন করিয়া পারি কাজ ফরষা করিব। আমি নিজে সব করিব, তোমাকে কেবল কাজ শেষ হওয়ার পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি ছাই তোমাকে দিয়া হবে না ? তোমার যদি এতটুকু ভরসা নাই তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন ? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন ?"

রামলাল বলিল,—

"তা তুমি যা বলিবে তাই আমি শুনিব। তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে আমি সেই দিকেই চলিব; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি বিষ টিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো ?"

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—

"তোমার মাথা, আহম্মক, ভেড়াকান্ত, সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—

"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ ? বল কি বলিবে। যা বলিবে তাই আমি করিব।"

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—

"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—

"দেখিও, সাবধান। একটু এদিক ওদিক হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—

"সে জন্য ভয় নাই। আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর এক দিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, সুতরাং, সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ একখানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এদিকে ওদিকে কয়েকটী লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভাল বাসে। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ কখন শুনে নাই ও বলে নাই। কালী নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখাশোভিত শির, নস্যপূর্ণ নাসা, পুণ্ড্র যুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধাম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ; এজন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী সময় নাই,

অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্ খিট্ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত এবং কখন মাথা কুটিয়া কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া আছেন এবং সকল জ্বালার শেষ হইবে মনে করিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে আজি কালীরই একদিন কি তাঁহারই একদিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখিবেন না। কিন্তু এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, কালী যতই অন্যায় কাজ করুক এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভাল বাসিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই জানিত না এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই এক খানা সোণা রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী, ফলাহারে বসিয়া নিজে না খাইয়াও বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন, ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। তিনি জানিতেন এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন। ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে তাহা তিনি বড় একটা মনে করিতেন না। কালী ভাবিত, হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা। আমার পোড়া কপাল তাই ওর হাতে পড়েছি।

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশি ঠাকুরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী হইতে।"

অন্য দিন হইলে কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া কাপ্তিনি মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিশন সমেত হিসাব করিয়া জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—

"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরি হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগ-ভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে যে কালী সত্য সত্যই খেঙরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে যে কালী বাপান্ত করিয়া ছাড়ে, মারিব বলিয়া ভয় দেখাইলে যে কালী তাঁহার সটীক শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে দীনবন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতি গতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, তা তো হতেই পারে। সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম বন্ধ করাইয়া যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই তো আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া কি আমি সুখ পাই? তোমাকে দুটা রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয় তাহা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলে মানুষ; পাছে সকল কথা সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, এই জন্য এই একটা সাবধানের কথা সময়ে সময়ে তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই তবে কে বুঝাইবে বল?"

কালী তখন দড়ীদ্বারা লম্বিত এক বাঁশের আল্‌না হইতে এক খানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—

" আমি কি তোমার চেয়ে পণ্ডিত যে তুমি যেমন বুঝাইবে, আমিও তেমন বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আমাদের এদেশে আর কেহ নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া কোন কথা বুঝিতে হইলে আমাকে কি রামা হাড়ির কাছে যাইতে হইবে? "

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন কি সৌভাগ্য! আমার কালীর এমনই দেব প্রকৃতিই বটে; তবে ছেলে মানুষ; এতদিন সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভগবান কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—

" লোকে আমাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখসচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে তাহার কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না। "

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,—

ছিঃ ছিঃ! এজন্য তুমি মনে দুঃখ করিতেছ! তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত মানী আর কে আছে? অনেক সুকৃতি ফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি; নারায়ণ করুন যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।"

এবার ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি ভট্টাচার্য্যের কপালে এমন সুখ একদিনও ঘটে নাই। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া কালী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

" রাত্রি অনেক হইল, খাওয়া দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে দই চিড়া ও সন্দেশ ফলারের জন্য দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। ওঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়; আর দেরি করিলে অসুখ হইবে। "

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়েতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই তো তিনি দধি চিনি টক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি কি মিষ্ট! আজি তাঁহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণকুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহসজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী, মধুরভাষিণী, এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পান দিলেন। তিনি কালীকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্ম সমস্ত করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই।

সমালোচন বিভ্রাট।

জগু বাবু খাতা মুখস্থ করণে গাঢ় নিবিষ্ট।

জগু। (দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, হার্বার্ট্ মিল, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ স্পেন্স্—আ-হা-হা-হা! দূ-র হোক্ গে ছাই—বেটাদের নাম গুলো এমন বদ্ যে মুখস্থ কর্ত্তে না কর্ত্তে উল্টে পাল্টে একাকার হয়ে যায়! আর পোড়া কালও এমন পড়েছে যে, এমন লিখ্তে পারি, এমন কইতে পারি, এমন সমালোচনা কর্ত্তে পারি—এমন স-ব পারি, তবু সে-ই ইংরেজি দু একটা বোল, দু এক খান বইএর নাম, দু একটা মানুষের নাম, এ না কর্ত্তে পার্‌লে লোকে বাহবা দিতেই চায় না।

(রঘুর প্রবেশ।)

আস্তে আজ্ঞা হয়, রঘু বাবু! কবির সঙ্গে তিন তিনটা দিন দেখা না হওয়া আমি বড় দুর্লক্ষণ মনে কচ্ছিলেম।

রঘু। (উপবেশনান্তে) মনে কর্‌লে দুর্লক্ষণের হাত এড়াতে না পার্‌তেন এমন বোধ হয় না।

(কানাইএর প্রবেশ)

কানাই। বেশ হয়েছে আজ আপনারা দু জনে উপস্থিত আছেন; দেখে শুনে আমার বইএর যা হয়, একটা এস্‌পার ওস্‌পার ক'রে দিন।

জগু। তাই ত, আপনাকে আজ আস্‌তে বলেছিলেম বটে, কিন্তু আমার হয়েচে কি জানেন, অবকাশ আজ কাল বড় কম। অনেক লিখ্‌তে হয়, ভাব্‌তে হয়, মেলা ইংরেজি বই পড়তে হয়, কখন্ আপনার বই দেখি ?

রঘু। (কানাইএর প্রতি) কি বই ? সে দিন যে উপন্যাস খানি এনেছিলেন সেই খানি নাকি ?

কানাই। আজ্ঞে হঁা, সেই খানি। তা দেখুন, আজ আপনারা দুজনেই আছেন, এমন সুবিধে সব দিন হবে না।

জগু। তা আচ্ছা, আজ যতটা হয় হোক্। তা আপনিই পড়ুন, আমরা শুনে যাই।

কানাই। (পুস্তক খুলিয়া) "বিজয়গ্রামের একটি পর্ণকুটীরে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন—

জগু। ও হ'ল না, উপন্যাস ধরাই হ'ল না।

রঘু। ও হ'ল না, হ'ল না।

কানাই। তবে কি ক'রে ধরবো বলুন !

জগু। উপন্যাস লেখা কি আপনি সহজ মনে করেন, মশায়? আপনি মেকলের এ-টা পড়েন নি ?

কানাই। কি টা বলুন দেখি ?

জগু। ঐ-যে এ-টা,বেশ নামটি, মনে পড়্‌চে না। তা যাই হোক, সে-টা কি আপনি পড়েন নি ?

কানাই। কি-টা বল্‌চেন ভাল বুঝতে পাচ্চিনে। তা উপস্থিত স্থলে কি দোষটা হয়েছে সেইটাই বলুন না কেন?

জগু। দোষ-টা কি হয়েছে জানেন, ও উপন্যাস ধরাই হয় নি। (একটু ভাবিয়া) ভাল; ঐ বুড়ী বই কি ওদের ঘরে আর কেউ ছিল না?

কানাই। হাঁ—ছিল, তা এর পরেই জান্‌তে পার্‌বেন।

জগু। কে ছিল?

কানাই। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী কন্যা -দুঃখের সময়ে বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন।

জগু। বেশ ছিল। আপনার উপন্যাসে জিনিস আছে, কিন্তু আপনি তা সাজাতে পারেন না।

কানাই। তা ভাল, কি ক'র্‌লে সাজে তাই না-হয় বলুন?

রঘু। ঐ খান থেকেই উপন্যাস ধরুন।

কানাই। কোন্ খান থেকে?

রঘু। ঐ-যে ঐ দুঃখের সময়ে এক মাত্র অবলম্বন—

কানাই। তা এখন কি ক'রে হবে?

জগু। কেন? ধরুন—"বিজয় গ্রামের একটি অট্টালিকার বাতায়নে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা আজ কি ভাবিতেছিল—"

কানাই। অট্টালিকা ত ছিল না—অট্টালিকা কোথা পাবে? আপনাকে ত বল্লুম একটি পর্ণকুটীরে—

রঘু। ছি ছি ছি, আপনি কবি হ'য়ে এমন কথা বল্‌চেন? অট্টালিকা সে ত আপনার হাত—বিশেষ তাতে যখন খরচ পত্র কিছুই নেই, তখন আপনি কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

কানাই। কুণ্ঠিত কি জানেন, বই খান লিখে শেষ করেছি, মিছামিছি মাঝখানটা তুলে নিয়ে এসে গোড়ায় লাগিয়ে দিয়ে—সে আবার এখন একটা কি হবে?

জগু। ঐ! ঐ-টি বোঝেননি ব'লেই ত এত গোল। সামান্য গল্প আরম্ভ করার চেয়ে উপন্যাস আরম্ভ করার যে একটু কৌশল, একটু কারদানি আছে, সে টুকু সকলে জানে না।

কানাই। বল্লেও কি বুঝ্‌তে পারব না?

জগু। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি! আপনি আইভ্যানহো—আচ্ছা তার দরকার নেই, আপনাকে একটা ছোট বই থেকেই বুঝিয়ে দিচ্চি, গল্প কি রকম জানেন? যেমন—

"যাদব নামে একটি বালক ছিল। তার বয়ক্রম নয় বৎসর। সে পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত। স্কুল হইতে সমপাঠীদের কাগজ কলম চুরি করিয়া আনিত। শিক্ষক মহাশয় এই দোষে তাহার নাম কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"
—বুঝ্‌তে পাল্লেন?

কানাই। তা বুঝ্‌লেম। এখন একে নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ ক'রতে হবে কি রকম কারদানি ক'রে বলুন।

জগু। উপন্যাসের বেলা পৈত্রিক নিয়মানুযায়ী 'যাদব নামে' ব'লে গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌লে চলবে না।

কানাই। তবে কি কর্‌তে হবে?

জগু। তখন আপনাকে ঐ 'চুরি করা' থেকে ধর্‌তে হবে। তার পর তাকে নিয়ে পথে পথে খেলিয়ে বেড়াতে হবে; তার পর তার বয়ক্রম নয় বৎসর হবে; তার পরে, সে যাদব হবে। শেষে যখন দেখ্‌বেন সে যাদব হ'ল, তখন উপসংহারে যেমন আছে—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেই উত্তম উপন্যাস হবে।

রঘু। এই ত জানি! (একটু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু, জগু বাবু! যাদব চুরি করার দরুন দণ্ডটা পাবে কি? তা হ'লে উপন্যাসে ধর্ম্মভাবটা এসে পড়ে না?

জগু। হাঁ হাঁ, ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন। বটে বটে, নাম কেটে তাড়ালে চলবে না!

কানাই। তবে কি তাকে কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌তে হবে?

জগু। আঁ-আঁ, কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌বেন?—না, তা কেন? কি বল হে, রঘু বাবু!

রঘু। ভাল, তার জন্য আট্‌কাচ্চে না, ও কিছু কঠিন কথা নয়, ওটা আপনাকে এখনি ব'লে দিচ্চি।

কানাই। কি বলুন?

রঘু। আচ্ছা, তার জন্য ব্যস্ত কি? ততক্ষণ আর একটা জায়গাই পড়ুন না শুনি।

কানাই। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে একটা জায়গা খুলিয়া) শুনুন—"নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ. কেবল কুটীরের সম্মুখে তেঁতুল গাছের তলায় একটা পলায়িত গাভী রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে হম্বা রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে"—

জগু। ঐ দেখুন, হল না!

রঘু। ঐ দেখুন, আপনি কি করতে গিয়ে কি ক'রে ফেল্লেন!

কানাই। কেন মহাশয়! এতে কি দোষ হ'ল আবার?

জগু। আগেই ত ব'লেছি আপনি সব জিনিস ধ'রে টান দেন, কিন্তু সাজাতে পারেন না।

কানাই। কি করলে তবে সাজ্‌তো বলুন?

জগু। সাজ্‌তো?—বলি, গাভীটে ওখানে কেন? ঐ বিজয়গ্রামে কোকিল কি ছিল না?

কানাই। তা কেন থাকবে না?

জগু। তবে কি ম'রেছিল?

রঘু। এমন জ্যোৎস্নালোকে যদি তাকে পাওয়া না গেল, ত সে থাকায় ফল কি? তেমন কোকিলের বাপ নির্ব্বংশ হোক্‌ না?

কানাই। সে যা হোক্‌, এই—না আর কিছু ভুল আছে?

জগু। ভুল ভুল কি? ঐ ত এক বিষম ভুল—গাভী ওখানে থাকতেই পারে না।

রঘু। ওর বাবার সাধ্য কি 'কুহু কুহু' রব করে?

কানাই। তা এখন করতে বলেন কি?

জগু। এখনি ও গাভীটে কেটে দিয়ে ওখানে 'কোকিল' ক'রে দিন।

রঘু। 'হম্বা' টা কেটে 'কুহু কুহু' ক'রে দিন।

কানাই। ভাল, তা হল, আর কিছু কর্ত্তে হবে?

রঘু। ও গাছটা বদ্‌লাতে হবে।

কানাই। বদ্‌লে কি কর্‌ব ?

রঘু। 'তমাল' ক'রে দিন।

কানাই। তাও হ'ল।

জগু। এ বার একবার পড়ুন দেখি ?

কানাই। "নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল কুটীরের সম্মুখে তমাল গাছের তলায় একটা পলায়িত কোকিল রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।"

জগু। হাঁ, অনেকটা হ'য়ে এসেছে।

রঘু। অনেকটা; কিন্তু কোকিল কি যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ?

জগু। হাঁ হাঁ, ঐ টা 'নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে না' ক'রে দিতে হবে।

কানাই। আজ্ঞে, আজ তবে এই অবধিই ভাল, আবশ্যক হয় ত আর এক দিন তখন এসে ভাল ক'রে সব জেনে যাব।

রঘু। না না, তা হয় কি—কোথা যাবেন—বসুন বসুন! ঐ যে কবিতার মতন ও একটা কি দেখা যাচ্চে ?

জগু। হাঁ হাঁ, বসুন বসুন—আজ আমরা দুজনেই আছি—ঐ যে ও একটা কি দেখা যাচ্চে ?

কানাই। ও একটা ঐ উপন্যাসেরই কবিতার মত কয়েক ছত্র।

রঘু। ভাল ওটা পড়ুন দেখি ?

কানাই। আচ্ছা—তবে না হয় শুনুন :—

উৎসবের হাসি গিয়াছে ফুরায়ে,
হাহা রব শুধু নিশিদিন,
শ্যাম বিনে আজ আঁধার সকল,
গোকুল যেন প্রাণহীন।

রঘু। থাক্ থাক্, ও আর ব'ল্‌তে হবে না, বোঝা গেছে—বোঝা গেছে!

কানাই। কেন কি হ'ল ম'শায়! শেষ হতেই দিন—এর মধ্যেই কি বুঝলেন ?

জগু। কবিতার ও রকম নিয়ম নয়, (রঘু বাবুর দিকে ফিরিয়া) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। ও ত কবিতাই হল না—'সজনি' নেই, 'জোছনা' নেই, 'বাঁশী' নেই, 'স্বপন' নেই, 'কি-যেন-কি' নেই—আর ওর সব্‌ই ত বুঝ্‌তে পাল্লেম।

কানাই। বুঝ্‌তে পাল্লেন—তাতে দোষ হ'ল কি? সে টা ত বোধ হয় ভালই হ'ল।

রঘু। আজ্ঞে, না মহাশয়! প্রকৃত কবিতা—হৃদয়ের কবিতা যে কি তা আপনারা মোটেই বোঝেন না, তাই এমন কথা বল্‌চেন।

কানাই। তবে কি আপনি বল্‌তে চান, যা বুঝ্‌তে না পারা যায় সে গুলোই ভাল কবিতা?

জগু। অনেকটা তাই বটে, (রঘু বাবুর প্রতি) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। নিশ্চয়ই তাই। আপনি বোধ হয় ইংরেজি কবিতা বেশি পড়েন না? ইংরেজিতে এমন ঢের ভাল কবিতা আছে, আমরা ত এখনও তা বুঝ্‌তে পারিই নাই, তা ছাড়া মাষ্টার মশাই ব'লেছিলেন যে, ইংরেজদের ত জাতিভাষা—তারাও বুঝ্‌তে পারে না।

কানাই। ভাল যদি তাই-ই হয়, তা হ'লেই কি এমন প্রমাণ হ'চ্চে যে সরল হলে, বোঝা গেলে, সেটা কবিতা হবে না?

রঘু। হঁা তা-ই বটে, তবে ঠিক তা-ই নয়। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক সরল কবিতা আছে যে পড়্‌লে বা শুন্‌লে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আমার এমন সহস্র সহস্র কবিতা মুখস্থ আছে।

কানাই। একটা শুনতে পাই নে?

রঘু। তা এখনি বল্‌তে পারি, আজ পারি, কাল পারি, আপনার যে দিন—যখন ইচ্ছা শুনতে পারেন।

কানাই। তা একটা এখনি বলুন না?

রঘু। তা কেন বল্‌তে পারবো না? এখনি পারি, আজ পারি, কাল পারি—আপনি কি মিথ্যা কথা মনে কচ্চেন?

কানাই। এ আপনি কেমন বল্‌চেন? মিথ্যা মনে করবো কেন—আমি একটা শুনবো ব'লেই ত আপনাকে ব'ল্‌তে বল্‌চি?

রঘু। আচ্ছা, বলচি। আপনি ড্যান্‌টির এ-টা পড়েচেন ?

কানাই। কি টা?

রঘু। আচ্ছা, তায় আর কাজ নাই, আপনাকে সামান্য বই থেকেই একটা শোনাচ্চি, কবিতাটা কেমন চমৎকার দেখুন দেখি ! কবিতা আছে—

Thirty days have September,

April, June and November ;

February hath twenty-eight alone,

And all the rest have thirty-one.

কানাই। (একটু হাসিয়া) এটা কি বড়ই সুন্দর কবিতা ?

রঘু। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না ?

জগু। (কানাইএর প্রতি) বলেন কি মশাই, একি কম কবিতা ! আপনি এতে কবিত্ব দেখ্‌তে পাচ্চেন না ? এর যে অক্ষরে অক্ষরে কবিত্ব, বিশেষতঃ ৩য় পংক্তিটা পড়ুন দেখি—" Februry hath twenty-eight alone"—উঃ, কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ! এই অসার সংসারে—এই ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে ফেব্রুয়ারির কি অল্প পরমায়ু ! আমি যখনি ফেব্রুয়ারির কথা মনে করি, তখনি অবসন্ন হ'য়ে পড়ি ! উঃ, আপনি এখন ভেবে দেখুন দেখি, এতে কি কম কবিত্ব—কম উচ্ছ্বাস—কম আধ্যাত্মিক ভাব ! এ লিখ্‌তে কি কম ফিলজফির দরকার ?

কানাই। তা ভাল, এবার থেকে না হয় ঐ রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করবো। আজ এখন তবে আমি চল্লেম মহাশয় !

(কানাইয়ের প্রস্থান)

রঘু। আমিও এখন তবে আসি।

(রঘুর প্রস্থান)

জগু। (পকেট হইতে খাতা টুকু বাহির করিয়া দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জনষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর (ইত্যাদি মুখস্থ করণ)

রুক্মাবাই।

এ পোড়া হিন্দুস্থানে হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুর আর হিন্দু-হৃদয় নাই, হিন্দুর আর হিন্দুমস্তিষ্ক নাই। হিন্দু না ইংরাজ, না মুসলমান, না পার্শী। হিন্দু যে এখন কি, তাহা নির্ণয় করিতে বুঝি একা জগদীশ্বরই সক্ষম। বুঝি ইংরাজ, মুসলমান বা পার্শী হইলে হিন্দুর গতিমুক্তি স্থিরীকৃত হইবার অনেকটা সম্ভাবনা ছিল।

হিন্দু যদি এখন হিন্দুপ্রকৃতিস্থ হইত, তবে এই তুচ্ছ রুক্মাবাই আন্দোলনে কথা কওয়া নিতান্ত অনিবার্য্য হইলে, আগেই সহজ কথাটা কহিয়া নীরব হইত ও তৎসঙ্গে প্রতিকূলবাদীকেও নীরব করিত। কিন্তু, প্রকৃতিস্থ হওয়া দূরে থাক, হিন্দু এখন নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে অক্ষম। হিন্দু এখন কি খায় তা জানে না, কি চায় তা জানে না; কি পরে তা জানে না, কি পড়ে তা জানে না; কি সাজে তা জানে না, কি ভজে তাহাও জানে না। হিন্দু এখন আপনাকে আপনি জানে না।

কিন্তু হিন্দু যে এখন মানুষের মত তাহা বটে। হিন্দু মানুষের মত খায়দায়, শোয়, কথা কয়, ইত্যাদি করে। আর একটী কথাও আধুনিক হিন্দু সম্বন্ধে সত্য। হিন্দু এখন উন্নতিশীল, হিন্দু "জাতীয় দাঁড়ীপাল্লায়" উঠিয়াছেন বা উঠিতেছেন। আর আমার বন্ধু মহাশয় কর্ণমূলে বলিতেছেন হিন্দুর একটী মাত্র অভাব বর্ত্তমান। অভাবটী গুহ্য—কিন্তু দীর্ঘ।

রুক্মাবাইয়ের মোকদ্দমার সহিত হিন্দু স্ত্রীশিক্ষার যে কি সম্বন্ধ তাহা স্থির না হইলেও, রুক্মাবাই আন্দোলনে হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা লইয়া একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা এই সুযোগে "তর্কের পুঁজি" বৃদ্ধি করিতেছেন, হৃদয় চিরিয়া অশিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীর জন্য নিজ নিজ সহানুভূতির গভীরতা দেখাইতেছেন, নিজ জাতিকে গালি পাড়িয়া "কিংকর্ত্তব্য" বিষয়ে "পরামর্শ" ঝাড়িতেছেন, সভা করিয়া "প্রতিজ্ঞা"-পুঞ্জ জারি করিয়া, দুই আনা, পাঁচসিকা সহি করিতেছেন, সাহেবদের গদ্গদ প্রাণে নিজ নিজ গদ্গদ প্রাণ মিশাইয়া, সেই গদ্গদ গলিত প্রাণ থালায় মাখিয়া, স্যাম্পেনে সিক্ত করিয়া, দুর্ভাগ্য দাদাজির পিণ্ড

গিলিতেছেন। আর যাহা যাহা করিতেছেন, তাহা সংবাদ পত্রে দেদীপ্যমান !

আর রুক্মাবাইবিরোধীরা যে কি করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে একটা কথা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা দুর্ভাগ্য দাদাজীর পক্ষ, হতভাগিনী রুক্মার প্রতিপক্ষ ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে রাজসর্দ্দারি পক্ষে খড়্গহস্ত। রুক্মাকে আমি "হতভাগিনী" বলিয়াছি, রুক্মা হতভাগিনীই বটে। হতভাগিনী না হইলে রুক্মা হতভাগাদিগের দলে পড়িত না, হতভাগাদিগের হাতে পড়িয়া বিপর্য্যস্তা হইত না। আর দাদাজী "দুর্ভাগ্য" কারণ তাহা না হইলে এমন হতভাগিনীর হাতে পড়িবে কেন? দাদার কিছু জোর কপাল, তাহা না হইলে হিন্দু হইয়া হিন্দু ধর্ম্মপত্নির পতিত্ব সংস্থাপনের জন্য তাহাকে কাজির আশ্রয় লইতে হইবে কেন?

কিন্তু রুক্মা হতভাগিনী হইলেও, রুক্মার বিবেচনায় রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী। তাহার কারণ, সাহেবেরা তাহাকে দেশে বিলাতে হতভাগিনী বলিয়া জানিয়াছে, হতভাগিনী বলিয়া তাহার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহার জন্য "প্রাণের" সহানুভূতি করিতেছে, চাঁদা তুলিতেছে। এমন কি তাহার চাঁদমুখে মুগ্ধ হইয়া চাঁদমুখেরা—দাদার গোলমাল চুকিলে—তাহার বর হইতেও প্রস্তুত। নীচজাতীয়া হিন্দুর মেয়ে চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইয়াছে। দাদাকে দাদা বলার প্রায়শ্চিত্য যদি উর্দ্ধগতি হয়, তবে রুক্মা দাদাকে আর কিছু বলিতেও প্রস্তুত। রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী। তবে রুক্মার সৌভাগ্যশশীর সম্প্রতি এক কলা লোপ পাইয়াছে। সে লোপ দাদা-কৃত। হতভাগাদের সাহায্যে রুক্মা ইংরাজিতে ইংরাজি সংবাদপত্রে লম্বালম্বা পত্র ঝাড়িয়া নিজ বিদ্যা জাহির করিয়াছিল। দাদা রুক্মার বিদ্যা বাহির করিয়া দিয়াছে।

রুক্মা দাদার বিবাহ খারিজ করিয়া বিলাতী বা দেশী সাহেব বিবাহ করিতে চায়। এই হাড়ি ডোমের অপেক্ষা নীচ ব্যাপারে হিন্দুর কথা কহিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেশী বিলাতী সাহেবেরা এই সুযোগে হিন্দু বিবাহ, হিন্দু আচারব্যবহার, রীতিনীতি লইয়া একটা কিচি-মিচি লাগাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মবিবাহ পদ্ধতিতে তাঁহাদের অনাচার

সৌখীন বিবাহের পদ্ধতি চালাইতে চাহেন। স্পর্দ্ধা বড় কম নহে। হিন্দু খেপিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরাজি শিক্ষায় হিন্দুর হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিগড়িয়া না যাইলে, হিন্দু এই স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে অল্প ধীর ভাষায় বাহবা লইতে পারিত। কিন্তু একে "সুশিক্ষার" মাহাত্ম্য, তাহাতে আবার চটিয়া উঠিয়াছে। ধীর শান্ত ভাবে মর্ম্মভেদী, মস্তিষ্কভেদী সাদা কথা কহিবার হিন্দুর কোন উপায় নাই। তাই আবল তাবল যাহা যোগাইতেছে, তাহাই বলিতেছে; হাবড়হাটি যাহা কলমাগ্রে আসিতেছে তাহাই লিখিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষ উদ্রেক করা তর্কে জিতিবার এক প্রধান উপায়। সাহেববাদীরা তাই সুবিধা পাইয়া বেশ এক হাত লইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার কথায় হিন্দু হারি মানিয়া আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিতেছে—"সময়ে আমাদিগের ললনাবৃন্দ শিক্ষিতা হইবে। হিন্দুনারীর শিক্ষা হইবার সময় চাই। জোর করিলে চলিবে না, ইত্যাদি" মাথামুণ্ড।

দাদা রুক্মাকে পান বা না পান, বা রুক্মা দাদাকে লইয়া সুখী হউন বা না হউন. সে বিষয়ে আমরা এক প্রকার উদাসীন। তবে হিন্দু স্ত্রীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে ব্যথা লাগে। সাহেবেরা বলিলে লাগে না, বরং হাস্যের উদ্রেক হয়, ক্ষণকালের জন্য অনেকটা বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সুযোগ হয়। ব্রাহ্ম বা দেশী সাহেবেরা বলিলেও সে আঘাত লাগে না। হিন্দু, হিন্দু নারীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে। হিন্দু যাহার কাজে নিত্য নিত্য উচ্চ শিক্ষা পান; যাহার সহবাস-মার্জ্জনে হিন্দু মার্জ্জিত রুচির বড়াই করিয়া থাকেন; যাহার অধ্যাপনে হিন্দু পশুবৃত্তি দমন করিতে শিখেন; যাহার স্বর্গীয় উপদেশে হিন্দু নিত্য দয়া, ধর্ম্ম পালন করেন; যে দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া, যে দেবীকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া হিন্দু দেবভাবে পূর্ণ, তাহাকে অশিক্ষিতা বলা কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? এ কৃতঘ্নতা বুঝি সেক্ষপীয়র কথিত পাষাণ-হৃদয় দানবেও সম্ভবে না!

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের ধর্ম্মক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমিতে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মদীপ জ্বলিতেছে। এই

দীপের উজ্জ্বল আলোকে প্রাচীন জগৎ আলোকিত ছিল, যেমন আজি এই নব্য জগৎ আলোকিত হইয়াছে। আজিকার এই নব্য জগতে এমন কোন সভ্যতাভিমানী জাতি বা স্থান নাই, যাহার ধর্ম্মদীপ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রদীপ হইতে জ্বালিত নয়। এ কথা মুখের কথা নহে। ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতেরা ইহার প্রধান প্রধান সাক্ষী। ভারতবর্ষ যে ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এ কথা লইয়া এখন আর পাদ্‌রী সাহেবরাও বিবাদ করেন না। ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থানে যে ধর্ম্মই সকল বিষয় অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, ইহা অতি সহজ কথা। শুদ্ধ প্রবল নহে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মই সার। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সকলই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সকলই ধর্ম্মোদ্ভূত। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, এই পুণ্যস্থানে ধর্ম্মই সকল নীতির, সকল অনুষ্ঠানের ভিত্তি ও মেরুদণ্ড। হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মার্থে। হিন্দুর পত্নী ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিনী। হিন্দুর সহধর্ম্মিনী হিন্দুর ধর্ম্মচিন্তার সহায়, ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়। তাই হিন্দুপত্নীর শিক্ষার জন্য শৈশবকাল হইতেই হিন্দুমাতা ব্যস্ত। যখন ইংরাজমাতা বালিকা কন্যাকে এ, বি, সি, চিনিতে শিখান, হিন্দুমাতা তখন সেঁজুতির ব্রত ধারণ করাইয়া, ছয় সাত বৎসরের বালিকা-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করেন। কোমল নারী-হৃদয়ের ন্যায় ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র আর নাই। ক্ষুদ্র বালিকাবস্থায়, হৃদয়ে এই বীজ উপ্ত হইলে, এই বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যৌবনাবস্থায় তাহা কিরূপ সুফলসুশোভিত পাদপে পরিণত হয়, তাহা হিন্দুর ভাগ্যক্রমে হিন্দুই অবগত। হিন্দু সে পাদপছায়ায় নিত্য শীতল হন, সেই পাদপের সুমিষ্ট ফলভক্ষণে নিত্য উদর পূরণ করেন, সেই পাদপস্থিত বিহঙ্গমের তানে বিভোর হইয়া নিত্য শ্রবণমন তৃপ্ত করেন, সেই স্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলিত পাদপতলে শয়ন করিয়া নিত্য ইন্দ্রত্বস্বপ্নবিমিশ্রিত সুখনিদ্রায় অভিভূত হন, সেই শান্তিপবিত্রতাময় পাদপতলে সমাসীন হইলে, হিন্দুর চিন্তা সেই পরম ব্রহ্মের প্রতি ধাবিত হয়। হিন্দু ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

নারী যে শিক্ষার উপযুক্ত, নারীর যে শিক্ষার প্রয়োজন, নারীর যে শিক্ষা হইলে নারীর নিজ মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সাধিত হয়,

হিন্দু নারীকে সেই শিক্ষা প্রদান করেন। কোমলাঙ্গী নারীর হৃদয় ও মন বড় কোমল, হৃদয় ও মনের বৃত্তি ও ভাবগুলি বড় কোমল। হিন্দু, নারীকে এমন শিক্ষা দেন যাহাতে সেই কোমল হৃদয়, কোমল মন, কোমল ভাব, কোমল বৃত্তিগুলি আরও কোমল হয়—যাহাতে হৃদয় বিশ্বব্যাপী হয়, মন প্রশান্ত হয়, ভাব প্রস্ফুটিত হয়, বৃত্তি নির্ম্মল হয়। ধর্ম্মশিক্ষায় তাহা করে—আর কোন ধর্ম্মে না করিতে পারে, হিন্দুধর্ম্মে তাহা করে। সেঁজুতির ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া, কুমারী অবস্থায় বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, হিন্দুনারী কত ব্রত ধারণ ও উদ্‌যাপন করে, তাহা হিন্দুতেই জানে। এই ব্রতানুষ্ঠানের জ্ঞানগর্ভ নীতি, পবিত্র উপদেশ ও স্বর্গীয় শিক্ষা মানবীকে দেবী করিয়া তুলে।

এই ত গেল হিন্দুনারীর ধর্ম্মনীতিশিক্ষা। এই ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা শিক্ষা হয়, তাহা হিন্দুনারী ভিন্ন, জগতে আর কোন দেশে, নারীর সে শিক্ষা হয় কি না, তাহা কোন ইতিহাসে লিখে না। অতি বালিকাবস্থায় হিন্দুনারী যে পতিসেবা শিক্ষা পায় তাহা জগতে অতুলনীয়। পতিই হিন্দুনারীর ইহকালের আশ্রয় ও পূজ্য পদার্থ, পরকালের আশা ও গতিমুক্তি। শৈশবে এই পতিপূজার উদ্বোধন আরম্ভ হয়। শৈশবেই ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুমাতা হিন্দুকন্যার কোমল উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে এই পতিভক্তির বীজ বপন করেন। ধর্ম্মশিক্ষার সহিত এই শিক্ষা বিজড়িত, বিমিশ্রিত, একীভূত। পতিই হিন্দুনারীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। হিন্দু-পত্নীর চিন্তা, কামনা, উদ্দেশ্য পতিপদেই সীমাবদ্ধ। পতিপদই হিন্দুপত্নীর ব্রহ্মপদ। এই নীতি কেবল পুঁথিতেই প্রকটিত নয়, বচনে বিবৃত নয়, উপদেশে নিহিত নয়। এই স্বর্গীয় নীতি হিন্দুপত্নীর হৃদয়ে—আজিকার এই পোড়া হিন্দুস্থানেও—হিন্দুপত্নীর অন্তরের অন্তরে, সেই পবিত্র স্থানে, সেই স্বর্গভূমে এই স্বর্গীয় নীতি দৃঢ়বদ্ধ। এই পতিভক্তির শক্তি সহায়ে হিন্দুনারী জড়জগতে ও অন্তর্জগতে সর্ব্ববিজয়িনী হয়েন। হিন্দুপত্নীর এই পতিভক্তিশিক্ষার বিরুদ্ধে ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্ম ও ভ্রষ্ট সমাজের অনেক মাথামুণ্ড তর্ক আছে, তাহা পরিশিষ্টে বিচার করা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুনারীর এতদ্ভিন্ন আর কি শিক্ষা হয়। পতিগৃহে যাইলে হিন্দুনারীর

পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে এক পরীক্ষা গৃহকর্ম্ম। গৃহকর্ম্ম না জানিলে পতিগৃহে পৌরস্ত্রীগণ কন্যার নিন্দা করিবে, হিন্দুমাতা সে নিন্দার পথ পূর্ব্ব হইতে বন্ধ করেন, কন্যাকে বালিকাবস্থা হইতে সাধ্যমত গৃহকর্ম্ম শিখান। পতিগৃহে গমনকালে হিন্দুপত্নী গৃহমার্জ্জনা হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত অগণিত কার্য্যে সুদীক্ষিতা। পতিভাগ্যের সহিত যাহার ভাগ্য একীভূত, তাহাকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। দাসদাসী না থাকিলে হিন্দুর গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। গৃহকর্ম্ম পড়িয়া থাকিলে পতিসেবার ত্রুটি হইবে, হিন্দুপত্নীর সে ত্রুটি অসহ্য। গৃহমার্জ্জনা, তৈজসমার্জ্জনা, রন্ধনক্রিয়া, শয্যারচনা এইরূপ প্রধান প্রধান গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য শত শত কার্য্যেও হিন্দুপত্নীর ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দাসদাসীতে সম্ভবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুনারীর কোন্ শিক্ষার অভাব, যে আজি এই "মহাশিক্ষিত" বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা হিন্দুনারীকে অশিক্ষিতা বলিয়া থাকেন? "ইউরোপীয় শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নারী" এই কথাটা আজি কালি ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু নারী কি শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নয়? Educated এবং accomplished নয়? এই ইংরাজী কথা দুইটার যদি বাঙ্গালা অর্থ থাকে, এই শব্দ দুইটা যদি কোন দুর্ব্বোধ্য দেব বা দানব ভাষান্তর্গত না হয়, তবে হিন্দুনারীর ন্যায় শিক্ষিতা, মার্জ্জিতা, Educated, accomplished নারী জগতের আর কোন দেশে নাই। আর কোন দেশের শিক্ষামার্জ্জনাগৌরবান্বিত নারীবৃন্দ হিন্দুনারীর পাদপদ্মের সেবাদাসী হইবারও উপযুক্ত নয়। যদি গুণ লইয়াই কথা হয়, তবে গুণে হিন্দুনারী সাক্ষাৎ দেবী, ও তাহার তুলনায় অন্য দেশীয়া শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নারীকে মানবী, দানবী বা রাক্ষসী বলিতে হইবে।

শান্তিসংস্থাপনই সমাজগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক, সমাজে সেই শান্তিসংস্থাপনের জন্য নারীর উপর কি কি কার্য্যভার ন্যস্ত। পুরুষ সংসার নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া পুরুষ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম করিবেন। নারী সেই বিশ্রামবাসের কার্য্যকর্ত্রী। পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া যাহাতে পুরুষ বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন, বিষয়ব্যাপারবিক্ষুব্ধ মন যাহাতে শান্তিস্নিগ্ধ হয়, গৃহকর্ত্রীর তাহাই সর্ব্বপ্রধান

কার্য্য। ইহা না হইলে, পুরুষ পরিশ্রমে উৎসাহিত হইবে না, পরিশ্রম না করিলে অর্থোপার্জ্জন হইবে না, অর্থোপার্জ্জন না হইলে সংসার চলিবে না, সংসার না চলিলে দীনদরিদ্রপরিপূর্ণ সমাজে শান্তি থাকিবে না। হিন্দুপত্নী পতির জন্য বিশ্রামের সেই সকল উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই শান্তির সুধাময় সরবৎ শ্রান্ত পতির মুখে তুলিয়া দেন। তখন শ্রম অপনোদিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়, হৃদয় শান্ত হয়, মন তৃপ্ত হয়, চিন্তা ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এই ধর্ম্মপথেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সঙ্গিনী। তখন পুরুষ নারীকে যত জ্ঞান দিতে লাগিলেন, নারী ভক্তিপ্রদানে তাহা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। পুরুষ যত বহির্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন, নারী তত অন্তর্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পুরুষ হারিমানিলেন, বলিতে বলিতে পুরুষের মনোবৃত্তিগুলি, পুরুষের হৃদয় ভাবগুলি কোমল হইল, রূঢ় প্রকৃতি মার্জ্জিত হইল। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া, ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া, ভক্তিচক্ষে সম্মুখস্থ মানবীকে দেবী দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন নারী

" কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু !
স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধানে কি শোভন সেতু !

হরি ! হরি ! পুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন !—

" সবিলাস বিগ্রহ মানস-সুষমার !
আনন্দের প্রতিমা আত্মার !
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার !
মুগ্ধময়ী মুরতি মায়ার !
যত কাম্য হৃদয়ের
সংগ্রহ সে সকলের—
কি বুঝাব ভাব রমণীর ?
মণিমন্ত্রমহৌষধি সংসার ফণীর !

তখন পুরুষ মহোল্লাসে দেবীকে হৃদয়ে টানিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মর্ত্ত্য স্বর্গ হইল !

আর নারীর ? এ ধর্ম্মজীবনে, এই পতিসেবায় নারীর কি কোন সুখ নাই ? আছে—নারীর যাহা সুখ তাহা পুরুষের নাই। পতিপদই নারীর

পদ। নারীর গতিমুক্তি সেই ব্রহ্মপদে, চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে—সেই পতিপদে। রীর ধর্ম্মচিন্তা সীমাবদ্ধ, পুরুষের মহাসাগরের ন্যায় অসীম। হিন্দু পুরুষের চিন্তার কূল নাই। নারীকে কূলে উঠাইয়া, হিন্দু পুরুষ অকূলে ভাসেন। র পর, ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? প্রাণ ভরিয়া, প্রাণ পাতিয়া, আশ টাইয়া ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? যে মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবাসিয়াছে, সেই নিবে ভালবাসিয়া হিন্দুনারী কি অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রীতি সম্ভোগ করে। হা! এই ধর্ম্মশিক্ষা, এই প্রেমশিক্ষা হিন্দু নারীকে কে শিখাইল?

এখন হিন্দুনারীর বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে পারিলে প্রবন্ধ লিখার যন্ত্রণা এড়াইতে পারি। হিন্দুসমাজ যে ধারায় গঠিত, দুসংসার যে নিয়মে সংরক্ষিত, তাহাতে হিন্দুনারীর যৌবনবিবাহ হইতে র না। হিন্দুসংসার একান্নভুক্ত। এই একান্নভুক্ত হিন্দুসমাজ এক টী ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট। ইহাতে গবর্ণর জেনারেল আছে, লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর ছে, কমিশনরগণ আছে, জেলা-প্রতিনিধি আছে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ল নিম্ন কর্ম্মচারী যেমন গবর্ণর-জেনারেলের অধীন, তেমনি হিন্দুসংসারের লেই কর্ত্তা মহাশয়ের অধীন। এই কর্ত্তার একটী গিন্নি আছেন। তিনি নানা বিভাগের 'কর্ত্তা'। তাঁহার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ তাঁহার আজ্ঞাধীন। ন হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত কার্য্যসম্বন্ধে তিনি অপ্রতিহত প্রতাপশালিনী। নি যাহা করেন, যাহা হুকুম করেন, তাহাই হয়। তিনি যাহা করেন তাহা-ই হিন্দুসংসারের মঙ্গল সংসাধিত হয়, হিন্দুসংসার সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত । হিন্দু খাইয়া বাঁচে, পরিয়া বাঁচে, শুইয়া বাঁচে। কর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের বিভাগের আয় সংগ্রহ ও একত্রিত করিয়া ব্যয় করেন। আয়ের াগগুলি বড় অল্প, ব্যয়ের বিভাগগুলি গণিয়া পাওয়া যায় না। স্বজন-লী পুরুষস্ত্রী যে যেখানে আছেন, সকলেরই আহারবসনভূষণের ভার ার হস্তে। ইহার মধ্যে মাসতুত ভাইয়ের পিসতুত ভগ্নী আছেন, এবং াত ভগ্নীর পিসতুত নাতিও বিদ্যমান। ইহাদের খাইবার সংস্থান নাই, খাইতে দিলে মরিবে। হিন্দুসমাজে লাইফ ইনস্যুয়রান্স ফণ্ড নাই। তিপন্ন স্বজনই হিন্দুর ইনস্যুয়রান্স ফণ্ড। হিন্দুর পুত্রবধূ সেই মাসতুত-য়ের পিসতুত ভগ্নী ও মামাত ভগ্নী[illegible]সতুত নাত্নি সম্মিলিত সংসারে

আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। বাস করিতে করিতে, স্বামিসেব শিখিতে শিখিতে, শ্বশুরসেবা, শাশুড়ীসেবা শিখিতে শিখিতে সম পরিবারের সেবা শিখিয়া ফেলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর অন্তর্ধ্যান হইলে পুত্রবধূর ঘোমটা খসিলে, স্বামীর উপর একাধিপত্য স্থাপিত হইলে পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ সমান বর্ত্তমান! "কর্ত্তা গিয়াছে গিন্নি গিয়াছেন, বধূমাতা আছেন—বধূমাতা বাঁচিয়া থাকুন!" বধূমা এ আশীর্ব্বাদের যথাযোগ্য পাত্রী। তিনি অন্নপূর্ণা, তিনি অনাথের সহা বিপন্নের আশ্রয়, হিন্দুসংসার মধ্যে শান্তির একমাত্র কেন্দ্র! হিন্দুগৃহে গৃহলক্ষ্মী!

ইংরাজি-শিক্ষিতা, বিদ্যা-গর্ব্বিতা, কোর্টসিপ-লব্ধা ফুল্লযুবতী পুত্র হিন্দুসংসারে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক মহাবিপ্লব স্ব করিবেন। হাতের বরণডালা হাতেই রাখিয়া শাশুড়ী একহস্ত লম্ব ঘোমটা টানিয়া লজ্জা নিবারণ করিবেন। গৃহিণীর অঞ্চলধারণ ভিন্ন ক মহাশয়ের ভয় দূর হওয়া সুকঠিন। নববধূর বুট-তলে দুগ্ধালক্তক শুখাইতে শুখাইতে পুরুষস্ত্রীগণ পলায়ন পথান্বেষণে ব্যতিবস্ত। এক নিশীথে "মশারি-বক্তৃতার" পর প্রাতে মহাপ্রলয়ক্রিয়া সমাপ্ত! নোয়ার আ ভিতরে কেবল নবদম্পতী পরিদৃশ্যমান!

সাদা কথাটা এই, অগ্রে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসংসার নূতন পদ্ধতিতে, ইংর ধরণে গঠিত কর, তাহার পর হিন্দুস্ত্রীর যৌবন-বিবাহ দিয়া পঞ্চ ডাইভোর্স কোর্টের কলঙ্ক-রহস্য বৃদ্ধি করিতে পার। আধুনিক উচ্চশিক্ষি দিগের স্বামিগণ কিরূপ পত্নীসুখ সম্ভোগ করেন, তাহা আর আজব তাঁহাদিগকে খুলিয়া বলিতে হয় না। সম্প্রতি সম্প্রদায় বিশেষের জন্য একটী ডাইভোর্স কোর্টের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনে দেশী-খৃষ্টান সম্প্রদায় বলিতেছেন তাঁহারা যুবতী পত্নী চাহেন না, বালিকা হিন্দুপত্নী চাহেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব বলিতেছেন, "বিলাতী যুবতী-বিবাহে সুখ নাই, বুঝি বালিকা-বিবাহে আছে। তোমরা সুখে আছ, দাদা, আমাদের কোর্ট-সিপের [illegible] নাই!" কথা এই। পুরানে যুবক কিম্বা যুবতীর মাথার [illegible]

থাকে না, রূপজ মোহ স্থিরবুদ্ধিকে নষ্ট করে। বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্য গুণই যুবক যুবতীর নয়ন মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। মাথায় রূপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে, বুদ্ধি, বিচার, দূরদর্শিতা সেই আগুণে দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সময়ে সে আগুণ নিভে। তখন ডাইভোর্স কোর্টে সেই দগ্ধ বুদ্ধি, দগ্ধ বিচার, দগ্ধ দূরদর্শিতার সহিত দগ্ধ হৃদয়ের একত্রে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হয়।

বলিবার আরও কথা আছে। তবে ছুতারের মেয়েকে লইয়া এত হাঙ্গামার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ছুতারের মেয়ে যদি এখনও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে আমি—হিন্দু ব্রাহ্মণ—প্রস্তুত।

যাও, রুক্মা, ঐ জাগ্রতা মহালক্ষ্মী-পদে পতিনিন্দা মহাপাপ ন্যস্ত করিয়া, ঐ সমুদ্র-সৈকতে পতিপদে ক্ষমা ভিক্ষা লইয়া, ঐ সাগরতলে গিয়া শয়ন কর! এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে তুমি পরজন্মে আবার হিন্দুনারী হইতে পার। তখন পতিপদ সেবা করিয়া পতিপদ ভেলায় অনায়াসে এই ভবসাগর পার হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গাঁথা মালা।

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!
সারা বন বুলে বুলে
বন-ফুল তুলে তুলে,
গাঁথিনু চিকণ মালা
দিব কারে উপহার?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

হৃদয়ে বাসনা ভ'রে
গাঁথিলাম যার তরে,
সে কোথা চলিয়ে গেছে
জানিনে ত কিছু তার;
কেন তবে গেঁথে মালা
মিছে বাড়াইনু জ্বালা,
হৃদয় ডুবায়ে দিনু
শোক-হ্রদে নিরাশার!

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার !

আগে ত জানিনে মালা
গাঁথিলে কাঁদিতে হবে,
কাঁদিতে সাধনা ক'রে
কে মালা গাঁথিত তবে ?
এত আশা ল'য়ে মনে
কে আসিত ফুল-বনে,
লতিকারে ব্যথা দিতে
কে হরিত ফুল তার ?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার !

গেয়ে এসেছিল অলি
চুমিতে কুসুম-কলি,
ফিরে তারা চ'লে গেল
ক'রে সবে হাহাকার !
তরু-তলে ফেলে গেল
বিরলে নয়নাসার !
আমি যেন তাই নিয়ে,
মালা গেঁথে তাই দিয়ে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
আশা-পথ চেয়ে তার ;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইলসার !

অতি অবশেষ নিশি,
শেফালি পড়িছে খসি,
উষারে জাগাতে আসি
ডাকে বায়ু বারেবার
অলসে আকাশ গায়
ম্লান চাঁদ ডুবে যায়,
তারা-মালা পড়ে খ'সে—
যামিনীর গাঁথা হার
আমি শুধু সারা নিশি
প্রহর গণিনু বসি,
ফুল-দল পড়ে খসি,
ফুরায় সুরভি-ভার ;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার !

প্রাণের মাঝারে আজি
উথলে যমুনা-জল,
কি দিয়ে কেমনে সখি
রোধিব তাহারে বল,
জীবন সে কোন্ পুরে
আলয় খুঁজিছে দূরে,
হৃদয় যে ভেঙেচুরে
হ'য়ে গেল একাকার
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচা[র্য]